গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা

জেলা তথ্য ঃ যশোর

আবু মোস্তফা কামাল উদ্দিন
এবং
আফসানা ইয়াসমীন

জানুয়ারি, ২০০৫

প্রোগ্রাম ডেভেলপমেন্ট অফিস
সমন্বিত উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রকল্প

জেলা তথ্য :
যশোর

প্রকাশকাল :
জানুয়ারি, ২০০৫

প্রকাশনায় :
পিডিও-আইসিজেডএমপি
সায়মন সেন্টার (৫ম ও ৬ষ্ঠ তলা)
বাড়ি : ৪ এ, রোড : ২২
গুলশান ১, ঢাকা ১২১২
ফোন : (৮৮০-২) ৮৮২৬৬১৪, ৯৮৯২৭৮৭
ফ্যাক্স : (৮৮০-২) ৮৮২৬৬১৪
ই-মেইল : pdo@iczmpbd.org
ওয়েব সাইট : www.iczmpbangladesh.org
ও
পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো)
বাড়ি : ১০৩, রোড : ০১
বনানী, ঢাকা ১২১৩।

প্রোগ্রাম ডেভেলপমেন্ট অফিস - সমন্বিত উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (পিডিও-আইসিজেডএমপি) বাংলাদেশ, নেদারল্যান্ড ও যুক্তরাজ্য সরকারের অর্থায়নে পরিচালিত একটি বহুখাতভিত্তিক এবং বহুপ্রতিষ্ঠানভিত্তিক উদ্যোগ, যেখানে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় হচ্ছে মূল মন্ত্রণালয় এবং পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো) মূল সংস্থা।

মুদ্রন সহযোগিতায় :

ISBN :

তথ্যের প্রচার ও প্রসারের মাধ্যমে জনগণের ক্ষমতায়নের একটি প্রয়াস
জেলা তথ্য : যশোর

বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের ভূ-প্রকৃতি অন্য অঞ্চল থেকে স্বতন্ত্র। একদিকে প্রকৃতির অপার সম্পদ অন্যদিকে প্রকৃতির বিরূপতার প্রতি লক্ষ্য রেখেই এ অঞ্চলের ১৯টি জেলার উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে। এ লক্ষ্যে পিডিও-আইসিজেডএমপি প্রকল্প একটি নীতিমালার খসড়া প্রস্তুত ও কর্মকৌশল নির্ধারণ করছে। কর্মকৌশলগুলোর ভিত্তিতে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে। উন্নয়ন কার্যক্রমে জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে উপকূলীয় অঞ্চলের ১৯টি জেলার প্রতিটির জন্য একটি করে তথ্য বই লেখা হয়েছে যাতে করে জেলার জনগণ স্ব-স্ব জেলার উন্নয়ন পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে ভূমিকা রাখতে পারবে।

আবু মোস্তফা কামাল উদ্দিন এবং আফসানা ইয়াসমীন যৌথভাবে এই বইটি লিখেছেন। অন্যান্য যারা এই বই লিখতে বিভিন্ন সময়ে সহযোগিতা করেছেন তারা হলেন মহিউদ্দিন আহমদ ও ড. মোঃ লিয়াকত আলী। অক্ষর বিন্যাস ও লে- আউটে সহযোগিতা করেছেন মোঃ নুরুজ্জামান মিয়া।

বইটির পর্যালোচনাসহ মতামত দিয়েছেন পিডিও ও ওয়ারপো-র বিশেষজ্ঞ বৃন্দ। এ ছাড়া যশোর জেলার বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গ মতামত দিয়ে বইটিকে সমৃদ্ধ করেছেন।

ড. এম. রফিকুল ইসলাম বইটি লিখতে সার্বিক পরামর্শ ও দিক নির্দেশনা দিয়েছেন।

মুখবন্ধ

বাংলাদেশের ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম জেলাভিত্তিক। ঐতিহ্যগতভাবেই মানুষের জেলাভিত্তিক পরিচয় রয়েছে। অপরদিকে জেলাগুলোরও সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য রয়েছে। স্থানীয় পর্যায়ে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রও জেলা। অন্যদিকে উপকূলীয় জীবনমানের উন্নয়নের জন্য জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করার নীতিগত সিদ্ধান্ত উপকূলীয় অঞ্চলের নীতিমালায় রয়েছে।

সমন্বিত উপকূল অঞ্চল ব্যবস্থাপনার মূল নীতি হল জনগণের অংশগ্রহণে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন। উপকূলীয় অঞ্চল উন্নয়নে জেলাভিত্তিক উদ্যোগকে কার্যকর করতে প্রয়োজন জেলার জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ। তাই জেলার জনগণকে তাদের নিজ নিজ জেলার অবস্থা, অবস্থান, প্রাকৃতিক সম্পদ, সমস্যা ও সম্ভাবনা সম্পর্কে অবহিত করার জন্য জেলাভিত্তিক এই বই লেখা হয়েছে। উপকূলীয় ১৯টি জেলার জন্য আলাদা আলাদা বই লেখা ও প্রচার করা হচ্ছে।

এই বইটি লেখা হয়েছে যশোর জেলার জনগণকে উন্নয়ন কার্যক্রমে সংশ্লিষ্ট করার জন্য। এতে রয়েছে জেলার প্রাকৃতিক সম্পদের বর্ণনা, ভৌত ও মানব সম্পদের বর্ণনা এবং ভবিষ্যতে এ সম্পদের অবস্থা কি হতে পারে সেই বর্ণনা।

এই বই-এর প্রধান অংশগুলো হচ্ছে 'সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতা' এবং 'সম্ভাবনা ও সুযোগ'-এর উপর বিশদ বর্ণনা। এই বর্ণনার তথ্য ভিত্তিক বিশ্লেষণ উপস্থাপিত হয়েছে অন্যান্য অংশে। তাই জেলার সমস্যা ও সম্ভাবনাগুলো জেনে নিয়ে উন্নয়ন পরিকল্পনায় আগ্রহ সৃষ্টি ও অবদান রাখতে এই বই জনগণ তথা উন্নয়ন অংশীদারদের সাহায্য করবে।

তা ছাড়াও 'উপকূলীয় উন্নয়ন কৌশল নির্ধারণ' আলোচনা এবং অন্যান্য উন্নয়ন সহায়ক আলোচনায় এই বই সহায়তা করবে বলে আমরা আশা করি।

এই বইয়ের জন্য তথ্য নেয়া হয়েছে প্রধানত বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর বিভিন্ন প্রকাশনা থেকে। এর পরেই সবচেয়ে বেশি তথ্য এসেছে প্রকল্পের বিভিন্ন প্রকাশনা থেকে। এ ছাড়াও পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড, বাংলাদেশ আবহাওয়া পরিদপ্তর ও বাংলাপিডিয়া থেকে তথ্য নেয়া হয়েছে।

সাহায্য নেয়া হয়েছে যশোরের উপর লিখিত বিভিন্ন বই থেকে -

১. মিত্র, সতীশচন্দ্র, ১৯১৪। যশোহর খুলনার ইতিহাস-প্রথম খণ্ড। দে'জ পাবলিশিং। ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩, ১৯১৪।

২. মিত্র, সতীশচন্দ্র, ১৯২২। যশোহর খুলনার ইতিহাস-দ্বিতীয় খণ্ড। দে'জ পাবলিশিং। ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩, ১৯২২ ।

৩. বি.বি.এস., ২০০৩। কৃষি শুমারী ১৯৯৬ : জেলা সিরিজ যশোর। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো। ঢাকা, এপ্রিল ২০০৩।

৪. বি.বি.এস., ১৯৯৬। আদম শুমারী ১৯৯১ : জেলা সিরিজ যশোর। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো। ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬।

৫. ওয়াজেদ, আবদুল, ২০০২। বাংলাদেশের নদীমালা। পালক পাবলিশার্স। ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০০২।

৬. CEGIS, 2004. Vulnerability Analysis of Major Livelihood Groups in the Coastal Zone of Bangladesh. Final Report. Centre for Environmental and Geographic Information Services. Dhaka, May 2004.

৬. Bari, L., K., G., M., 1979. Bangladesh District Gajetteers Jessore, Establishment Division, Government of the People's Republic of Bangladesh. Dhaka, February 1979.

তথ্য নেয়া হয়েছে বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে যশোর জেলার উপর প্রকাশিত সংবাদ ও নিবন্ধ থেকে।

এ ছাড়াও বইটির বিশেষ পর্যালোচনা ও মূল্যবান তথ্য ও মতামত দিয়েছেন :

- জনাবা সাবিয়া খানম, এ্যাডভোকেট, মোমিন নগর, যশোর।
- জনাবা ক্লারা দীপ্তি কনা বাড়ৈ, নির্বাহী পরিচালক, গ্রামীণ মহিলা উন্নয়ন সংস্থা, কারবালা আবাসিক এলাকা, যশোর।

সূচীপত্র

মুখবন্ধ
জেলা মানচিত্র

সূচনা **১-৫**
এক নজরে যশোর ২
জেলার অবস্থান ৩
উপজেলা তথ্য সারণী ৪

প্রকৃতি ও পরিবেশ **৭-১৭**
প্রাকৃতিক পরিবেশ ৭
কৃষি সম্পদ ১১
দুর্যোগ ১৪
বিপদাপন্নতা ১৭

জীবন ও জীবিকা **১৯-২৪**
জনসংখ্যা ১৯
জনস্বাস্থ্য ১৯
শিক্ষা ২১
অভিবাসন ২২
সামাজিক উন্নয়ন ২২
প্রধান জীবিকা দল ২২
অর্থনৈতিক অবস্থা ২৩
দারিদ্র্য ২৪

নারীদের অবস্থান **২৫-২৬**

অবকাঠামো **২৭-৩১**
রাস্তা-ঘাট ২৭
নৌ-পথ ২৭
রেল পথ ২৮
বিমানবন্দর ২৮
পোল্ডার ২৮
হাট-বাজার ও বন্দর ২৯
বিদ্যুৎ ও টেলিযোগাযোগ ২৯
শিল্প ও বাণিজ্য অবকাঠামো ২৯
সেচ ও গুদাম সুবিধা ৩০
সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ৩১
উন্নয়ন প্রকল্প ৩১

সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতা **৩৩-৩৭**
পরিবেশগত সমস্যা ৩৩
কৃষি সমস্যা ৩৪
আর্থ-সামাজিক সমস্যা ৩৬
যোগাযোগ ৩৬
শিল্প ও বাণিজ্য ৩৬

সম্ভাবনা ও সুযোগ **৩৯-৪১**
কৃষি ও অর্থনীতি ৩৯
আর্থ-সামাজিক ৪০
শিল্প ও বাণিজ্য ৪০
প্রাকৃতিক সম্পদ ৪০
যোগাযোগ ৪১
পর্যটন শিল্প ৪১

ভবিষ্যতের রূপরেখা **৪৩-৪৪**

দর্শনীয় স্থান **৪৫-৪৬**

জেলা মানচিত্র

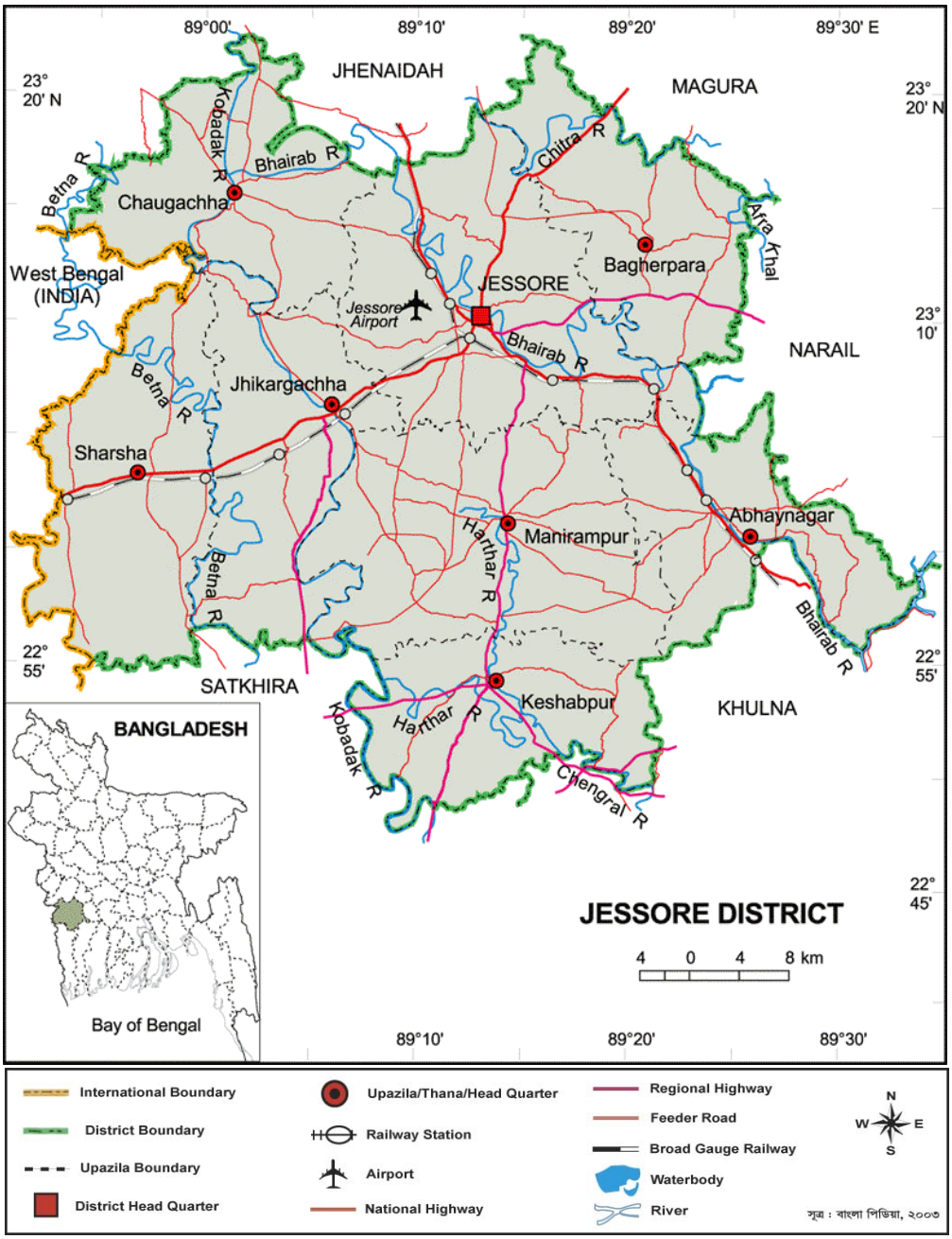

JESSORE DISTRICT
89°00'
89°10'
89°20'
89°30' E
23° 20' N
23° 10'
22° 55'
22° 45'
JHENAIDAH
MAGURA
NARAIL
KHULNA
SATKHIRA
West Bengal (INDIA)
Chaugachha
Bagherpara
JESSORE
Jessore Airport
Jhikargachha
Sharsha
Manirampur
Abhaynagar
Keshabpur
Kobadak R
Bhairab R
Chitra R
Afra Khal
Betna R
Harthar R
Chengral R
BANGLADESH
Bay of Bengal
4 0 4 8 km
International Boundary
District Boundary
Upazila Boundary
District Head Quarter
Upazila/Thana/Head Quarter
Railway Station
Airport
National Highway
Regional Highway
Feeder Road
Broad Gauge Railway
Waterbody
River
N
W
E
S
সূত্র : বাংলা পিডিয়া, ২০০৩

সূচনা

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে প্রতিবেশী দেশ ভারত ও বাংলাদেশের সীমান্তে অবস্থিত যশোর জেলা। এটি বাংলাদেশের মৃতপ্রায় বদ্বীপ (Moribund Delta) অঞ্চলের অংশবিশেষ। জেলার উত্তরে ঝিনাইদহ, পূর্বে নড়াইল ও মাগুরা, দক্ষিণে খুলনা ও সাতক্ষীরা এবং পশ্চিমে ভারত। যশোর জেলা একটি অতি প্রাচীন রাজ্য হিসেবে পরিচিত ছিল। খ্রিষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে প্রণীত টলেমী'র মানচিত্রে চিহ্নিত বদ্বীপের দক্ষিণাঞ্চলই বর্তমানের যশোর জেলা। টলেমী'র মানচিত্র দেখায়, খ্রিষ্টীয় প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীতে যশোর জেলাসহ বাংলার সমগ্র বদ্বীপ এলাকা গঙ্গারাষ্ট্র নামে এক শক্তিশালী রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তবে প্রাচীন সমতট জনপদের অংশ যশোর ১৭৬৯ সালে জেলা হিসেবে প্রতিষ্ঠা পায়। ১৭৮১ সালে রাজস্ব সংগ্রহের জন্য একজন কালেক্টর এবং পরে শান্তিরক্ষায় একজন ম্যাজিস্ট্রেট পাঠানো হয়। যার অফিস ছিল যশোর সদর দফতর থেকে দুই মাইল দূরে মুরালীতে। লোক সমাজে মুরালী কাচারি ১৭৯০ সালে সাহেবগঞ্জে সরিয়ে নেয়া হলে সাহেবগঞ্জই যশোর নামে পরিচিত হয়ে ওঠে। উল্লেখ্য, ১৯৪৭ সালে উপমহাদেশ বিভক্তির সময়ে যশোরের বনগাঁও ও গৈঘাটা থানা পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগনার সাথে যুক্ত হয়ে যায়। অর্থাৎ পাক-ভারত বিভক্তির সময়ে যশোর আংশিকভাবে বিভক্ত হয়ে পড়ে। পূর্বের যশোর জেলার সদর মহকুমা বর্তমানের যশোর জেলা। ১৯৮৪ সালে এটি জেলায় উন্নীত হয়।

যশোরের নামকরণ নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ রয়েছে। জেনারেল কানিংহ্যাম এর মতে, এই এলাকা আরবী 'জসর' বা Jasor নামে পরিচিত ছিল, যার বাংলা প্রতিশব্দ 'সেতু'। সেইসময়ে জেলার ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ সমগ্র জেলাকে আন্তঃবিভক্তকারী নদ-নদী-জলাশয়ের বিবেচনায় এরূপ নামকরণের যথার্থতা খুঁজে পাওয়া যায়। তাই বর্তমানের "যশোর" নামটি এর অপভ্রংশ বলে ধরে নেয়া হয়। তবে ইতিহাস অনুসারে মুসলমানদের অধীনে আসার পূর্বেও যশোর নামের উল্লেখ ছিল। একসময় যশোর একটি পীঠস্থান ছিল এবং জনৈক প্রতাপাদিত্য এই যশোর রাজ্যের রাজা ছিলেন। প্রতাপাদিত্যের পিতা বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকালে প্রথম "যশোহর" নাম হয়। এরপরে বাংলার শেষ পাঠান নৃপতি দাউদ শাহ্ মোগল কর্তৃক পরাজিত হয়ে পালিয়ে যাবার সময় রাজধানী গৌড় ও তান্ডার বেশির ভাগ রাজকীয় ধন সম্পদ বিক্রমাদিত্যের কাছে সমর্পনে বাধ্য হন। নব প্রতিষ্ঠিত যশোর নগরী এইভাবে গৌরের যশঃহরণ করে বলে এর নাম হয়ে যায় "যশোহর'। তাই স্থানীয় ঐতিহ্য অনুসারে, যশোর নামটি এসেছে "Yasohare" থেকে, যার অর্থ গৌরবের অবমাননা। বাংলা শব্দ 'যশ' ও 'হর' যার অর্থ গৌরবহানি থেকে যশোর নামের উৎপত্তি।

যশোর জেলার মোট আয়তন ২,৫৬৭ বর্গ কি.মি., যা সমগ্র দেশের আয়তনের ২%। আয়তনের দিক থেকে যশোর বাংলাদেশের ৬৪টি জেলার মধ্যে ২৪তম স্থানে, খুলনা বিভাগীয় ১০টি জেলার মধ্যে ৪র্থ স্থানে এবং উপকূলীয় অঞ্চলের ১৯টি জেলার মধ্যে আয়তনে ৯ম স্থানে রয়েছে।

৮টি উপজেলা, ৪টি পৌরসভা, ৯২টি ইউনিয়ন, ৩৬টি ওয়ার্ড, ১,৪৩৩টি মৌজা/মহল্লা ও ১,৪৩৪টি গ্রাম নিয়ে যশোর জেলা। অভয়নগর, বাঘেরপাড়া, চৌগাছা, ঝিকরগাছা, কেশবপুর, যশোর সদর, মনিরামপুর এবং শার্শা জেলার ৮টি উপজেলা। এদের মধ্যে মনিরামপুর উপজেলা আয়তনে সবচেয়ে বড় (৪৪৫ বর্গ কি.মি), যা জেলার মোট আয়তনের ১৭%। অন্যদিকে, অভয়নগর সবচেয়ে ছোট উপজেলা। এর আয়তন ২৩৬ বর্গ কি.মি. এবং এটি জেলার মোট আয়তনের মাত্র ৯% জুড়ে বিস্তৃত। যশোর শহর ভৈরব নদীর তীরে অবস্থিত। ৯টি ওয়ার্ড ও ৭৩টি মহল্লা নিয়ে যশোর শহর গঠিত। ১৮৬৪ সালে যশোর পৌরসভা গঠিত হয়। উল্লেখ্য, বাংলাদেশে উপকূলীয় অঞ্চলের ভূমিভিত্তিক সীমা নির্ধারণের জন্য তিনটি সূচক বিবেচনা করা হয়েছে। এগুলো হচ্ছে জোয়ার-ভাটার প্রভাব, লোনা পানির অনুপ্রবেশ এবং ঘূর্ণিঝড়/জলোচ্ছ্বাস। এর ভিত্তিতে এর ভিত্তিতে বরিশাল জেলার ৮টি উপজেলাই অন্তর্বর্তী উপকূলীয় (Interior Coast) এলাকায় পড়েছে।

উপজেলা	৮
পৌরসভা	৪
ইউনিয়ন	৯২
ওয়ার্ড	৩৬
মৌজা/মহল্লা	১,৪৩৩
গ্রাম	১,৪৩৪

এক নজরে যশোর

	বিষয়	একক	যশোর	উপকূলীয় অঞ্চল	বাংলাদেশ	তথ্য সূত্র ও বছর
এলাকা/ প্রশাসনিক	এলাকা	বর্গ কি.মি.	২,৫৬৭	৪৭,২০১	১৪৭,৫৭০	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	উপজেলা	সংখ্যা	৮	১৪৭	৫০৭	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	ইউনিয়ন	সংখ্যা	৯২	১৩৫১	৪৪৮৪	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	পৌরসভা	সংখ্যা	৪	৭০	২২৩	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	ওয়ার্ড	সংখ্যা	৩৬	৭৪৩	২৪০৪	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	মৌজা / মহল্লা	সংখ্যা	১,৪৩৩	১৪,৬৩৬	৬৭,০৯৫	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	গ্রাম	সংখ্যা	১,৪৩৪	১৭,৬১৮	৮৭,৯২৮	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
জনসংখ্যা	মোট জনসংখ্যা	লাখ	২৪.৬৯	৩৫০.৭৮	১২৩৮.৫১	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	পুরুষ	লাখ	১২.৮২	১৭৯.৪২	৬৩৮.৯৫	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	নারী	লাখ	১১.৮৭	১৭১.৩৫	৫৯৯.৫৬	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	জনসংখ্যার ঘনত্ব	বর্গ কি.মি.	৯৬২	৭৪৩	৮৩৯	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	লিঙ্গ অনুপাত	অনুপাত	১০৮.০	১০৪.৭	১০৬.৬	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	গৃহস্থালির আকার	গৃহ প্রতি জনসংখ্যা	৪.৭	৫.১	৪.৯	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	গৃহস্থালির মোট সংখ্য	লাখ	৫.২১	৬৮.৪৯	২৫৩.০৭	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	নারী প্রধান গৃহ	গ্রামীণ গৃহস্থের (%)	৪.০০	৩.৪৪	৩.৫০	১৯৯৬(বি.বি.এস.,১৯৯৯)
জৌত অবকাঠামো	টেকসই দেয়ালসম্পন্ন ঘর	মোট গৃহস্থের (%)	৮১	৪৭	৪২	১৯৯১(বি.বি.এস.,১৯৯৪)
	টেকসই ছাদসম্পন্ন ঘ	মোট গৃহস্থের (%)	৬০	৫০	৫৪	১৯৯১(বি.বি.এস.,১৯৯৪)
	বিদ্যুৎ সংযোগসম্পন্ন ঘর	মোট গৃহস্থের (%)	৩৯	৩১	৩১	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	প্রাথমিক স্কুল	সংখ্যা / ১০,০০০ জন	৭	৭	৬	২০০১(প্রা.শি.অ, ২০০৩)
	রাস্তার ঘনত্ব	কি.মি./বর্গ কি.মি.	১.২৫	০.৭৬	০.৭২	বিশ্ব ব্যাংক, ১৯৯৬ ও বি.বি.এস.,২০০৩
	বাজারের ঘনত্ব	বর্গ কি.মি. / সংখ্যা	৬৩	৮০	৭০	১৯৯৬ (বিশ্ব ব্যাংক, ১৯৯৬)
অর্থনীতি	মোট আয়	কোটি টাকা	৪,৭৪৫	৬,৭৮,৮০	২,৩৭০,৭৪	১৯৯৯/২০০০(বি.বি.এস.,২০০২)
	মাথাপিছু আয়	টাকা	১৮,৫৮৮	১৮,১৯৮	১৮,২৬৯	১৯৯৯/২০০০(বি.বি.এস.,২০০২)
	কর্মরত শ্রম শক্তি (১৫ বছর+)	হাজার	১,১৫৫	১৭,৪১৮	৫৩,৫১৪	১৯৯৯/২০০০(বি.বি.এস.,২০০২)
	কর্মরত নারী (খাদ্য বা অর্থের বিনিময়ে)	% (১৫-৪৯ বয়সদল)	৩৩	২৬	২৮	২০০১ (নির্পেটি, ২০০৩)
	কৃষি শ্রমিক	গ্রামীণ গৃহস্থের (%)	৪১	৩৩	৩৬	১৯৯৬(বি.বি.এস.,১৯৯৯)
	জেলে	গ্রামীণ গৃহস্থের (%)	১০	১৪	৮	১৯৯৬(বি.বি.এস.,১৯৯৯)
	মাথাপিছু কৃষি জমির পরিমাণ	হেক্টর	০.০৮	০.০৬	০.০৭	১৯৯৬(বি.বি.এস.,১৯৯৯)
	দরিদ্র	মোট গৃহস্থের (%)	৪৬	৫২	৪৯	১৯৯৮(বি.বি.এস.,২০০২)
	অতি দরিদ্র	মোট গৃহস্থের (%)	১৭	২৪	২৩	১৯৯৮(বি.বি.এস.,২০০২)
শিক্ষা	প্রাথমিক স্কুলে ভর্তির হার	৬-১০ বছর শিশু(%)	৯৮	৯৫	৯৭	২০০১(প্রা.শি.অ, ২০০৩)
	সাক্ষরতার হার, ৭ বছর+	মোট জনসংখ্যা (%)	৫১	৫১	৪৫	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	পুরুষ	%	৫৬	৫৪	৫০	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	নারী	%	৪৬	৪৭	৪১	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	সাক্ষরতার হার, ১৫ বছর+	মোট জনসংখ্যা (%)	৫২	৫৭	৪৭	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	পুরুষ	%	৫৯	৬১	৫৪	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	নারী	%	৪৫	৪৯	৪১	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
স্বাস্থ্য	গ্রামীণ পানি সরবরাহ (সক্রিয় টিউবওয়েল)	প্রতি গড় জনসংখ্যা	১১৪	১১১	১১৫	২০০২ (ডি.পি.এইচ.ই., ২০০৩)
	কল অথবা নলকূপের পানির সুবিধাপ্রাপ্ত ঘর	মোট গৃহস্থের (%)	৯৫	৮৮	৯১	২০০১(বি.বি.এস., ২০০৩)
	স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানার সুবিধাপ্রাপ্ত ঘর	মোট গৃহস্থের (%)	৩৭	৪৬	৩৭	২০০১(বি.বি.এস., ২০০৩)
	হাসপাতালে শয্যাপ্রতি জনসংখ্যা (সরকারি)	জন/ শয্যা	৫,৪৭৯	৪,৬৩৭	৪,২৭৬	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	নবজাতক মৃত্যুর হার	প্রতি হাজারে	৮৪	৫১-৬৮	৪৩	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	<৫ বছর শিশু মৃত্যুর হার	প্রতি হাজারে	৮৪	৮০-১০৩	৯০	২০০০ (বি.বি.এস. ও ইউনিসেফ, ২০০১)
	অতি অপুষ্টির হার	%	৭	৬	৬	২০০০ (বি.বি.এস. ও ইউনিসেফ, ২০০১)
	ছেলে	%	৫	৪	৪	২০০০ (বি.বি.এস. ও ইউনিসেফ, ২০০১)
	মেয়ে	%	৯	৮	৬	২০০০ (বি.বি.এস. ও ইউনিসেফ, ২০০১)
	মাতৃ মৃত্যুর হার	প্রতি হাজারে	৫	৫	৫	১৯৯৮/৯৯ (স্বাস্থসেবা অধিদপ্তর, ২০০০)
	আধুনিক জন্মনিয়ন্ত্রন পদ্ধতি গ্রহণকারী নারী	%	৫৬	৪১	৪৪	২০০১ (নির্পেটি, ২০০৩)

জেলার অবস্থান

জাতীয় অবস্থার তুলনায় ভাল দিক

- জেলার মাথাপিছু আয় ১৮,৫৮৮ টাকা, যা জাতীয় আয় (১৮,২৬৯ টাকা) ও সমগ্র উপকূলীয় অঞ্চলের (১৮,১৯৮ টাকা) তুলনায় বেশি।
- মাথাপিছু আয়ের ভিত্তিতে জেলার অবস্থান (বি.বি.এস., ক্রমানুসারে) সারা দেশের মধ্যে ৯ম স্থানে।
- জেলার ভূমিহীনদের সংখ্যা ৪৮%, যা জাতীয় (৫৩%) ও সমগ্র উপকূলীয় অঞ্চলের (৫৪%) তুলনায় কম।
- জেলায় ১৫-৪৯ বয়সদলের ৩৩% নারী খাদ্য বা অর্থের বিনিময়ে কর্মরত, যা জাতীয় (২৮%) ও উপকূলীয় অঞ্চলের (২৬%) তুলনায় বেশি।
- জেলার দারিদ্র্যপীড়িত ও অতিদরিদ্র গৃহস্থালির সংখ্যা যথাক্রমে ৪৬% ও ১৭%, যা জাতীয় (৪৯%, ২৩%) ও সমগ্র উপকূলীয় অঞ্চলের (৫২%, ২৪%) তুলনায় কম।
- জেলার মোট গৃহের ৯৫% কল বা নলকূপের পানির সুবিধাপ্রাপ্ত, যা জাতীয় হার (৯১) ও উপকূলীয় অঞ্চলের (৮৮%) তুলনায় বেশি।
- জেলার মোট বিদ্যুৎ সংযোগের পরিমাণ ৩৯%, যা জাতীয় (৩১%) ও উপকূলীয় অঞ্চলের তুলনায় (৩১%) বেশি।
- জেলায় গড়ে প্রতি ৬৩ বর্গ কি. মি. এলাকাতে একটি হাট-বাজার কেন্দ্র রয়েছে, যা জাতীয় (৭০ বর্গ কি. মি. এ একটি) ও উপকূলীয় অঞ্চলের (৮০ বর্গ কি. মি. এ একটি) তুলনায় সুবিধাজনক ।
- রাস্তার ঘনত্ব (১.২৫ কি. মি./ বর্গ কি. মি.), জাতীয় (০.৭২% কি. মি./বর্গ কি. মি.) ও উপকূলীয় অঞ্চলের (০.৭৬ কি. মি./ বর্গ কি. মি.) তুলনায় অনেক বেশি।
- সাক্ষরতার হার (৭^{+} বছর) ৫১%, যা জাতীয় (৪৫%) হারের তুলনায় বেশি ও উপকূলীয় অঞ্চলের (৫১%) সমান।
- জেলায় ১৩-৪৯ বয়স দলের নারীদের মধ্যে আধুনিক জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহারের হার ৫৬%, যা জাতীয় (৪৪%) ও উপকূলীয় অঞ্চলের (৪১%) হারের তুলনায় বেশি ।
- জেলায় প্রত্যন্ত এলাকা বা দ্বীপাঞ্চল নেই।
- একযোগে সড়ক, রেল, নৌ ও আকাশপথে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের সাথে সংযুক্ত।
- লিঙ্গীয় অসমতা অনেক কম ।

জাতীয় অবস্থার তুলনায় দুর্বল দিক

- জেলার বার্ষিক আয় প্রবৃদ্ধির হার ৫.২%, যা জাতীয় হার (৫.৪%) ও উপকূলীয় অঞ্চলের হারের (৫.৪%) কম।
- ক্ষুদ্র কৃষকদের সংখ্যা ৫৭%, যা জাতীয় (৫৩%) ও উপকূলীয় অঞ্চলের (৫৮%) তুলনায় বেশি।
- জেলার মাত্র ৩৭% গৃহে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানার সুবিধা আছে, যা জাতীয় (৩৭%) হারের সমান ও উপকূলীয় অঞ্চলের (৪৬%) তুলনায় অনেক কম।
- জেলার নবজাতক মৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ৫৫ জন, যা জাতীয় (৪৩ জন) হারের তুলনায় অনেক বেশি এবং সমগ্র উপকূলীয় অঞ্চলের বিবেচনায় প্রায় সমান (৫১-৬৮ জন)।
- হাসপাতালে শয্যা প্রতি জনসংখ্যা ৫,৪৭৯ জন, যা জাতীয় (৪,২৭৬) ও উপকূলীয় অঞ্চলের (৪,৬৩৭) তুলনায় বেশি।
- জেলায় শহুরে জনসংখ্যা মাত্র ১৭%, যা জাতীয় (২৩%) ও উপকূলীয় অঞ্চলের (২৩%) তুলনায় অনেক কম।
- জেলার পর্যটন আকর্ষণ অনেক কম।
- খনিজ সম্পদ নেই।

উপজেলা তথ্য সারণী

বিষয়		একক	যশোর	উপজেলা			
				শার্শা	মনিরামপুর	যশোর সদর	কেশবপুর
এলাকা/ প্রশাসনিক	এলাকা	বর্গ কি.মি.	২,৫৬৭	৩৩৪	৪৪৫	৪৩৩	২৫৯
	ইউনিয়ন/ ওয়ার্ড	সংখ্যা	১২৮	১৭	২৬	২৫	৯
	মৌজা / মহল্লা	সংখ্যা	১,৪৩৩	১৩৫	২৬৩	৩১৪	১৪২
	গ্রাম	সংখ্যা	১,৪৩৪	১৭২	২৩৮	২৫২	১৪২
জনসংখ্যা	মোট জনসংখ্যা	লাখ	২৪.৬৯	৩.০৯	৩.৮২	৬.৩৬	২.২৫
	পুরুষ	লাখ	১২.৮২	১.৬০	১.৯৭	৩.৩৫	১.১৫
	নারী	লাখ	১১.৮৭	১.৪৯	১.৮৫	৩.০১	১.১০
	জনসংখ্যার ঘনত্ব	জন/বর্গ কি.মি.	৯৬২	৯২১	৮৬০	১৪৭১	৮৭৩
	লিঙ্গ অনুপাত	অনুপাত	১০৮	১০৭	১০৭	১১১	১০৪
	গৃহস্থালির মোট সংখ্যা	লাখ	৫.২১	০.৬৫	০.৮০	১.৩১	০.৫০
	গৃহস্থালির আকার	জন/গৃহস্থালি	৪.৭০	৪.৭০	৪.৭৩	৪.৮৩	৪.৪৬
	নারী প্রধান গৃহ	মোট গ্রামীণ গৃহস্থের %	৪.০০	১.৬	১.৩	১.৪	১.২
ভৌত অবকাঠামো	টেকসই দেয়াল সম্পন্ন ঘর	মোট গৃহস্থের (%)	৮১	৮৮	৮৭	৭৪	৯২
	টেকসই ছাদসম্পন্ন ঘর	মোট গৃহস্থের (%)	৬০	৫৬	৬০	৬১	৭০
	বিদ্যুৎ সংযোগসম্পন্ন ঘর	মোট গৃহস্থের (%)	১৫	৭.৪৭	৯.৮৫	৩১.৪	৮.০৬
	প্রাথমিক বিদ্যালয়	মোট সংখ্যা	১,৬৩১	১৫৩	৩২২	৩৫৪	২১০
	মাধ্যমিক বিদ্যালয়	মোট সংখ্যা	৪৭৯	২৮	১১৩	৮৮	৬৭
	মহাবিদ্যালয়	মোট সংখ্যা	৬৪	৭	১০	১৭	৬
অর্থনীতি	কৃষি শ্রমিক	মোট গ্রামীণ গৃহস্থের %	৪১	৩২	৩৭	২৭	৩৯
	কৃষি প্রধান পরিবার	মোট গ্রামীণ গৃহস্থের %	৭১	৬৭	৭৫	৬৪	৭৬
	অকৃষি প্রধান পরিবার	মোট গ্রামীণ গৃহস্থের %	২৯	৩৩	২৫	৩৬	২৪
	মোট চাষের জমি	মোট কৃষি জমির (%)	১,৬৭,৩২১	২২,৩১০	২৯,২৬৯	২৫,৯৬৯	১৭,৬০৫
	এক ফসলী	মোট কৃষি জমির (%)	-	৪৫		২২	২৮
	দো ফসলী	মোট কৃষি জমির (%)	-	২০		৭৫	৬১
	তিন ফসলী	টাকা	-	৩৫		৩	২১
	প্রতি ০.০১ হেক্টর জমির মূল্য	%	-	৭,০০০	৭,০০০	৭,০০০	৬,০০০
শিক্ষা	সাক্ষরতার হার (৭ বছর+)	৬-১০ বছর শিশু (%)	৫১	৪৩	৫১	৫৯	৪৮
	প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির হার	৬-১০ বছর শিশু (%)	৯৮	৯৮	৯৬	১০৯	৯৪
	মেয়ে	সংখ্যা	১০০	১০০	৯১	১১৬	৯৪
স্বাস্থ্য	সক্রিয় টিউবওয়েল	মোট গৃহস্থের (%)	২১,৪২৭	২,৪৭৭	৩,৮৫৭	৩,৭১৮	২,৩১৯
	নিরাপদ পানির সুবিধাপ্রাপ্ত ঘর	মোট গৃহস্থের (%)	৯৯	৯৯	৯৯	৯৮	১০০
	স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানার সুবিধাপ্রাপ্ত ঘর	বর্গ কি.মি.	১৬	৮	৭	৩১	৭

উপজেলা				তথ্য সূত্র ও বছর
ঝিকরগাছা	চৌগাছা	বাঘেরপাড়া	অভয়নগর	
৩০৭	২৬৯	২৭১	২৪৭	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
২০	১১	৯	১২৮	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
১৭২	১৪৩	১৫৬	১০৮	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
১৭৪	১৫৮	১৯১	১০৭	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
২.৭৬	২.১০	১.৯৫	২.৩২	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
১.৪১	১.১০	১.০০	১.২২	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
১.৩৫	১.০০	০.৯৪	১.১০	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
৯০১	৭৮৪	৭২০	৯৪০	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
১০৫	১০৯	১০৭	১১১	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
০.৫৮	০.৪৫	০.৩৯	০.৪৯	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
৪.৭৫	৪.৬৪	৪.৯৯	৪.৭০	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
১.৬	১.১	১.২	১.২	১৯৯৬(বি.বি.এস.,১৯৯৯)
৯১	৮৮	৬১	৬৮	১৯৯১(বি.বি.এস.,১৯৯৪)
৬১	৫৫	৫৫	৫৪	১৯৯১(বি.বি.এস.,১৯৯৪)
১০.২৩	৩.৯৭	৫.২৮	১৬.০৪	১৯৯১(বি.বি.এস.,১৯৯৪)
১৬২	১৬০	১২৭	১৪৩	২০০১(প্রা.শি.অ, ২০০৩)
৪৬	৩৮	৪৪	৫৫	২০০২ (ব্যানবেইস, ২০০৩)
৭	৪	৭	৬	২০০২ (ব্যানবেইস, ২০০৩)
৩৪	৩২	৩০	৩১	১৯৯৬(বি.বি.এস.,১৯৯৯)
৬৭	৭৫	৭৯	৭৮	১৯৯৬(বি.বি.এস.,১৯৯৯)
৩৩	২৫	২১	২২	১৯৯৬(বি.বি.এস.,১৯৯৯)
২০,১৭৭	১৮,০২৩	১৯,৩৯৩	১৪,৫৭৩	১৯৯৬(বি.বি.এস.,১৯৯৯)
১	১১	১৪	২২	২০০৩ (বাংলাপিডিয়া, ২০০৩)
৭৬	৭০	৬৪	৪২	২০০৩ (বাংলাপিডিয়া, ২০০৩)
২৩	২০	২২	৩৬	২০০৩ (বাংলাপিডিয়া, ২০০৩)
৬,৫০০	১০,০০০	৭,৫০০	৭,৫০০	২০০৩ (বাংলাপিডিয়া, ২০০৩)
৫২	৪৪	৫১	৫২	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
৮৯	১০০	৯৯	৮৮	২০০১ (প্রা.শি.অ)
৮৯	১০৩	৯৯	৮৮	২০০১ (প্রা.শি.অ)
৩,০৪৮	২,০৪৯	১,৭৮৮	২,১৭১	২০০২ (ডি.পি.এইচ.ই, ২০০৩)
৯৯	৯৯	৯৭	৯৮	১৯৯১ (বি.বি.এস.,১৯৯৪)
৯	৮	৯	১৮	১৯৯১ (বি.বি.এস.,১৯৯৪)

প্রকৃতি ও পরিবেশ

গাঙ্গেয় উপদ্বীপ বা মৃতপ্রায় ব-দ্বীপ (Moribund Delta) হবার কারণে যশোর জেলার প্রাকৃতিক পরিবেশ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। জেলার উপর দিয়ে প্রবাহিত সতত পরিবর্তনশীল নদ-নদীগুলোর প্রধান বৈশিষ্ট্য ভাটিতে পানি নিঃসরণ ও জমির উচ্চতা-উর্বরতা বৃদ্ধি করা। তাই যশোর জেলার সামগ্রিক প্রতিবেশে এই নদ-নদীগুলোর গতিবিধি বিশেষ ভূমিকা রাখছে। বিল-বাওড়পূর্ণ যশোর জেলার কৃষির ধরন গড়ে উঠেছে ভূমি বৈচিত্র্য ও জলাভূমিকে কেন্দ্র করে, যা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের দাবীদার।

প্রাকৃতিক পরিবেশ

নদ-নদী : জেলার উপর দিয়ে প্রবাহিত কয়টি প্রধান নদী ভৈরব, চিত্রা, বেতনা, ইছামতি, কপোতাক্ষ ও হরিহর। মৃতপ্রায় ব-দ্বীপের কারণে জেলার নদীগুলোর গতিধারায় ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। জেলার মোট নদীপথ ২৩.৩৯ বর্গ কি.মি. যা জেলার মোট আয়তনের ০.৯১%। প্রধান এই নদীগুলো আবার অসংখ্য নালা ও খালে বিভক্ত হয়ে সমস্ত জেলা জুড়ে ছড়িয়ে আছে এবং খাঁড়ি, উপধারা দিয়ে বঙ্গোপসাগরের সাথে যুক্ত। দক্ষিণমুখি এই নদ-নদীগুলো কোনটি উজানে পলি পড়ে ভরাট হয়ে গেছে এবং কোনটি ভাটিতে নাব্য। জোয়ার-ভাটার নদীগুলোর নাব্যতা নির্ভর করে পলি সঞ্চয়নের উপর।

ভৈরব : ২৪৮ কি.মি. দীর্ঘ ভৈরব নদী যশোর-খুলনার দীর্ঘতম নদী। ভারতের মালদহে উৎসারিত হয়ে কিছু পথ পরেই পদ্মার দক্ষিণবাহী নদী জলঙ্গীর সাথে মিশেছে। দর্শনা রেল স্টেশন দক্ষিণ-পূর্ব কোণ থেকে ভৈরব নদী মাথাভাঙা নদী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যশোরে প্রবেশ করেছে। এরপর কোর্ট চাঁদপুর পর্যন্ত পূর্বদিকে প্রবাহিত হয়ে পরে দক্ষিণমূখী হয়েছে। একসময় এই নদীটি অত্যন্ত গভীর ও খরস্রোতা ছিল। যশোর ও খুলনার কৃষ্টি ও সংস্কৃতি এই ভৈরব নদীর কল্যাণে গড়ে ওঠে। কেননা অত্যন্ত গভীর, খরস্রোতা ও জীবন্ত এই নদীটির দুই ধারে একসময় অসংখ্য জনপদ গড়ে উঠেছিল। সুফী সাধক হযরত খান জাহান আলী এই নদী পথেই গৌড় হতে খুলনার বড়বাজার হয়ে বাগেরহাট যান। এটি একটি তীর্থ নদী হিসেবে পরিচিত। মোগল সেনাপতি মানসিংহ বিশাল বাহিনী নিয়ে যশোরাধিপতি প্রতাপাদিত্যকে দমন করার জন্য এই নদী অতিক্রম করেন বলে ইতিহাসে উল্লেখ রয়েছে। এক সময় সিন্দু নদের মতই এর মান মর্যাদা ছিল।

প্রধান নদী	**ভৈরব, চিত্রা, বেতনা, ইছামতি কপোতাক্ষ ও হরিহর**
নদীর দৈর্ঘ্য	**২৩.৩৯ বর্গ কি.মি.**
উৎপত্তি স্থান	**উজানের নদী ও ভারত সীমান্ত**

কপোতাক্ষ : ২৬০ কি.মি. দীর্ঘ কপোতাক্ষ নদী মাথাভাঙা থেকে দর্শনার কাছে উৎসারিত হয়ে চৌগাছা, ঝিকরগাছা, কোটচাঁদপুর, সাগরদাড়ি প্রভৃতি প্রসিদ্ধ স্থানের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে সুন্দরবনের মধ্য খোলপটুয়া নদীর সাথে মিশেছে। নদীটি তাহেরপুরের কাছে ভদ্রা ও ভৈরব এবং দেবু দুয়ারের কাছে মরীচাপ নদীর সাথে মিলিত হয়েছে। এই মিলিত স্রোত জায়গির মহালের কাছে কচুয়া নদীতে মিশে আড়পাংগাসিয়া নামে মালঞ্চ নদীর সাথে মিশে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে। বর্তমানে নদীটির উৎস মুখ শুকিয়ে যাওয়ায় বেশিরভাগ স্থানই নাব্য নয়। খুলনার অংশে নদীটি নাব্য। এতে লবণাক্ততা প্রতিরোধের জন্য বাঁধ দেয়া হয়েছে। কপোত বা পাখীর অক্ষের মতো স্বচ্ছ পানির জন্য এর নামকরণ করা হয় কপোতাক্ষ। কপোতাক্ষের তীরবর্তী বারুলা গ্রাম বিখ্যাত বাঙালী বৈজ্ঞানিক আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় এর জন্মস্থান। সাগরদাড়িতে কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের জন্ম। প্রতি বছর কপোতাক্ষের তীরের সাগরদাড়িতে মধুসূদন দত্তের জন্মোৎসব ও মধুমেলা হয়।

বেতনা : ১৯২ কি.মি. দীর্ঘ ভৈরবের শাখা নদী 'বেতনা' যশোর জেলার উত্তর-পশ্চিমে উৎপত্তি লাভ করে শার্শা উপজেলার নাভারণের কাছ দিয়ে দক্ষিণে প্রবাহিত হয়েছে। এক পর্যায়ে ভারত সীমান্ত ছুঁয়ে আবার যশোর সীমান্তে প্রবেশ করেছে এবং খুলনায় প্রবেশ করে কপোতাক্ষ নদীর সাথে মিলছে। শাখা নদী ডলুয়া বেনারপোতার কাছে সৃষ্টি হয়ে কালিয়া নদী নামে কপোতাক্ষে পড়েছে। মূল নদীটি চাপরার কাছে মরিচাপ নদীতে পড়লেও এটি বেতনা খোলপেটুয়া নামে পরিচিত। ভাটিতে বেতনা নদীতে জোয়ারভাটা খেলে ও নৌ চলাচলের উপযোগী। বেতনার উপরের অংশে নাভারণ থেকে কলারোয়া পর্যন্ত পাম্পের সাহায্যে পানি সেচের ব্যবস্থা আছে। নদীটি ভাটিতে নাব্য ও সারা বছর এতে ছোট ছোট নৌযান চলে। নদীটির সাথে প্রবাহমান সংযোগ খাল না থাকায় শুকনো মৌসুমে যশোর থেকে শংকরপুর অংশে লবণাক্ততা দেখা দেয়। তাই সেচ কাজের সুবিধার জন্য নদীপথে শংকরপুর স্থানে একটি বড় জলা-কাঠামো তৈরি করা হয়েছে। বেতনা নদীতে বন্যা প্রতিরোধ বাঁধ নির্মিত হয়েছে। এ ছাড়া নদী থেকে ৫ কি.মি. দীর্ঘ খাল কেটে সেচ ও কৃষি উন্নয়নের জন্য উলসী প্রকল্প নামে একটি প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে।

চিত্রা : চুয়াডাঙ্গা ও দর্শনার মধ্যবর্তী নিম্নাঞ্চলে চিত্রা নদী উৎসারিত হয়েছে। এরপরে দক্ষিণ-পূর্বে দর্শনা, কালীগঞ্জ, শালিখা ও কালিয়া উপজেলার ভিতর দিয়ে ১৩০ কি.মি. প্রবাহিত হয়ে গাজীরহাটে নবগঙ্গার সাথে মিলেছে। পরবর্তীতে এ মিলিত স্রোত খুলনার দৌলতপুরে ভৈরব নদীতে পড়েছে। বেগবতী এর উল্লেখযোগ্য শাখা নদী। নদীটি ভাঙন ও বন্যাপ্রবন নয়।

ইছামতি : যশোর জেলার পশ্চিম প্রান্ত দিয়ে প্রবাহিত ইছামতি একটি সীমান্ত নদী এবং এর মধ্যে প্রবাহ আন্তর্জাতিক সীমানা হিসেবে চিহ্নিত। এটি সুন্দরবনে রাইমঙ্গল নদীর সাথে মিলিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে। এটি জোয়ারভাটার নদী ও এর উজানে লবণাক্ততা কম। পূর্ণিমা-অমাবস্যায় ভাটিতে পানির ওঠা-নামার পরিমাণ ৩/৪ মিটার।

হরিহর : ঝিকরগাছা উপজেলার কাছে কপোতাক্ষ নদী থেকে হরিহর নদীর উৎপত্তি। এটি আলতাপোলে ভদ্রার সাথে মিলেছে এবং কেশবপুর থেকে আলতাপোল পর্যন্ত নদীটি সারা বছর ধরে নাব্য থাকে। কিন্তু, কেশবপুরের উপরে নদীটি মরা নদীতে পরিণত হয়েছে। নদীটির গতিপথে পলি জমে ভরাট হয়ে যাওয়া অংশে চাষাবাদ করা হয়।

বিল : যশোর বিল পূর্ণ জেলা। বিল বলতে বিল কেদারিয়া, বিল খুকশিয়া, বিল পাঁজিয়া, পাত্রা, বিল বকর, হরিণ বিল, অরল বিল, ইছামতি বিল যশোর জেলার প্রধান কয়টি বিল। প্রতিটি বিলের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রয়েছে। তাই বিলগুলো আকৃতি, প্রকৃতি ও গভীরতায় ভিন্ন। এদের কোনটি পলি জমে ভরাট হয়ে যাওয়ায় চাষাবাদের জমিতে পরিণত হয়েছে।

পূর্বের বিলগুলো বছরে অন্তত একবার ডুবে যায় এবং অতি দ্রুত পলি সঞ্চয়ন ঘটে। পূর্বের বিল এলাকায় প্রচুর পরিমাণে আমন ও বোরো ধানের চাষ করা হয়। অন্যদিকে, পশ্চিমের বিলগুলো তুলনামূলকভাবে গভীর এবং এগুলো নদী থেকে বন্যার পানি পায়নি, তাই পলিও পড়ে না। আয়তনে সবচেয়ে বড় আরল বিল। যশোর সদর উপজেলার ৫টি মৌজা ও ঝিকরগাছার ৬টি মৌজা জুড়ে বিস্তৃত। মণিরামপুরের বিল বকরের আয়তন ৩.৮৮ কি.মি.। বিল বকর নদীর সাথে সংযুক্ত এবং বন্যায় এই বিল মারাত্মক রূপ নেয়।

বিল	অবস্থান/ উপজেলা	আয়তন (বর্গ কি.মি.)
জলেশ্বর বিল	বাদরে পাড়া	৪.৫৩
বিল বকর	মনিরামপুর	৩.৮৮
হরিণা বিল	যশোর সদর	২.৫৯
অরল বিল	যশোর সদর	১১.৬৫
ইছামতি বিল	লোহাগড়া	১১.৬৫
বিল কেদারিয়া	মনিরামপুর	-
বিল খুকশিয়া	মনিরামপুর	-
বিল পাজিয়া পাত্রা	মনিরামপুর	-

উল্লেখ্য, এই বিলগুলোকে জোয়ার-ভাটার বেসিনে রূপান্তরিত করে জলাবদ্ধতা নিরসন ও নদীর নাব্যতা রক্ষার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। তাই বিল কেদারিয়ায় ২০০২ সালে খুলনা-যশোর ড্রেনেজ রিহ্যাবিলিটেশন প্রকল্প-র আওতায় জোয়ার-ভাটার পানি ব্যবস্থাপনা বা Tidal River Management-র জন্য জোয়ার-আঁধার (Tidal Basin) নির্মাণ করা হয়। এতে উজানের নদীর পলিপ্রবাহ এই জোয়ার-আঁধারে জমা হয়ে ভাটিতে পলি সঞ্চয়ন, নদী ভরাট বা নাব্যতা হ্রাস প্রতিরোধ সম্ভব হচ্ছে। দক্ষিণমুখী নদীগুলোর পানি নিসরণ সহজ হচ্ছে।

বাঁওড় : যশোর জেলার ভূ-প্রকৃতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য বাওর বা Oxbow lakes। বাওড়ের দিক থেকে যশোর জেলা বাংলাদেশের দ্বিতীয় প্রধান জেলা। এঁকে বেঁকে চলা নদী বিভিন্ন কারণে এবং গতিপথে পরিবর্তন করে লুপের সৃষ্টি করে। এই সমস্ত লুপ মাঝে মাঝে নদীর মূল প্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে জলাভূমির সৃষ্টি করে। এই প্রবাহমান বিচ্ছিন্ন জলাভূমি বাওড় নামে পরিচিত। প্রতিটি বাওড় আকৃতি, প্রকৃতি ও গভীরতার দিক থেকে ভিন্ন। বাটপারার বাওড়, জামপার বাওড়, বেদাপাড়া বাওড়, রামপুর বাওড়, বালুহীরের বাওড়, জয়দিয়া বাওড়, মানজাত বাওড় অন্যতম। কালিগঞ্জের মানজাত বাওড় আয়তনে সবচেয়ে বড় (৩.৮৮ বর্গ কি. মি.)।

বাওড়	উপজেলা	আয়তন (বর্গ কি.মি.)
জামপাড় বাওড়	মনিরামপুর	২.৫৯
বেদাপাড়া বাওড়	মনিরামপুর	২.৫৯
রামপুর বাওড়	মনিরামপুর	১.৯৪
বালুহীরের বাওড়	কোটচাঁদপুর	২.৫৯
জয়দিয়া বাওড়	কোটচাঁদপুর	২.৫৯
মানজাত বাওড়	কালিগঞ্জ	৩.৮৮
বের গোবিন্দপুর	ঝিকরগাছা	২.৫৯

সূত্র : যশোহর-খুলনার ইতিহাস (১ম খণ্ড), ৭২

পুকুর : জেলার সর্বত্রই ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে নানা ধরনের পুকুর। তবে জেলার উত্তরাংশে পুকুরের সংখ্যা বেশি। যার মোট এলাকা ৫,৪১৯ হেক্টর, এর মধ্যে মাছ চাষ করা হয় ৪,৬৪৮ হেক্টর পুকুরে। জেলার পরিত্যক্ত পুকুরের পরিমাণ ১৮৭ হেক্টর।

মোট পুকুরের পরিমাণ	৫,৪১৯ হে.
মাছ চাষের পুকুর	৪,৬৪৮ হে.
মাছ চাষযোগ্য পুকুর	৫৮৪ হে.
পরিত্যক্ত পুকুর	১৮৭ হে.

মাটি : জেলার অধিকাংশ এলাকা মরিবান্দ বদ্বীপের নিম্ন ও উর্বর অঞ্চলে অবস্থিত। অসংখ্য খাল-বিল ও নদী-নালা, বাওড়, পুকুর ও উন্মুক্ত জলাশয়ে পরিপূর্ণ জেলার ভূ-প্রকৃতি। উত্তর থেকে দক্ষিণে ক্রমশ ঢালু যশোর জেলার উচ্চতা সমুদ্র সমতল থেকে ৮ মিটার। পদ্মা ও তার প্রধান শাখা নদী মাথাভাঙ্গা ও গড়াই এখানকার সমভূমি গঠনে ব্যাপক ভূমিকা রেখেছে। ভূ-পৃষ্ঠের উপরের স্তরে কাদা পলি ও শুকনো বালির স্তর রয়েছে, যার গভীরতা ১২ মিটার থেকে ৪৬ মিটার। জেলার অধিকাংশ এলাকার মাটি দোআঁশ থেকে এঁটেল, হালকা বাদামী থেকে ধূসর বর্ণের এবং চুনযুক্ত। যশোর জেলা এগ্রোইকোলজিক্যাল জোন ১০ এবং ১৪ তে পড়েছে। অর্থ্যাৎ, জেলার কিছু অংশ গাঙ্গেয় নদী প্লাবন এলাকা এবং কিছু অংশ গোপালগঞ্জ-খুলনা বিল এলাকার অন্তর্গত। ভূ-প্রকৃতি অনুসারে জেলায় তিন ধরনের এলাকা চিহ্নিত করা যায়।

- উত্তরের উঁচু এলাকা
- মধ্যবর্তী এলাকা
- দক্ষিণের নিচু এলাকা

উত্তরাঞ্চল বা গঙ্গা নদী প্লাবন এলাকার মাটি বালু ও কাদা মিশ্রিত, স্বল্প মাত্রায় ক্ষারীয় ও উর্বর। তবে এই এলাকার উঁচু জমির মাটি ততটা উর্বর নয়। বেশিরভাগ নদীই মৃত হওয়াতে বর্ষায় প্রবাহ থাকে না। ফলে উত্তরাঞ্চল ক্রমাগত শুষ্ক এলাকায় পরিণত হচ্ছে। অন্যদিকে, জেলার মধ্যবর্তী এলাকা নিচু হওয়াতে বিল ও জলাপূর্ণ। দক্ষিণের এলাকা ফরিদপুরের নিম্নাঞ্চলের মত এবং এখানকার নদীতে সারাবছর জোয়ার-ভাটা অব্যাহত থাকে। দক্ষিণের এই বিল এলাকার মাটি ভারী ও কাদাময়, পীটযুক্ত ও মাঝারি ধরনের উর্বর জেলার

মাটির ধরন	গঙ্গা নদী প্লাবন ভূমি, বিল এলাকার ভারী ও কাদাময়, পীটযুক্ত মাটি, পুরানো গাঙ্গেয় নদী প্লাবন ভূমি
প্রধান বৈশিষ্ট্য	দোআঁশ থেকে এঁটেল, হালকাবাদামী থেকে ধূসর বর্ণের এবং চুনযুক্ত।

মধ্যাঞ্চলের মাটি পুরনো গাঙ্গেয় নদী প্লাবন এলাকার মত গাঢ়, কাদাযুক্ত ও পলিময়। জেলার মাটি পূর্বাঞ্চলে চুনযুক্ত গাড়-ধূসর, পশ্চিমাঞ্চলে চুনযুক্ত বাদামী-ধূসর ও বাদামী বর্ণের। জেলার নিম্নাঞ্চলের পীট বা দৈব মাটি আমন ধান এবং সবজি চাষের অত্যন্ত উপযোগী।

উল্লেখ্য, জেলার মাটির রকমফেরে ঋতু বৈচিত্র্য, নিষ্কাশন সমস্যা বা জলাবদ্ধতা ও ভাঙন ইত্যাদি বিশেষ প্রভাব রাখে। জেলার কোথাও কোথাও অম্লীয় ও ক্ষারীয় মাটি রয়েছে। মাটিতে লবণের সর্বোচ্চ মাত্রা ৪-৮ পিপিএম এবং ভূ-উপরিস্থিত পানিতে লবণের পরিমাণ <১ পিপিএম (এসআরডিআই, ২০০১)।

জলবায়ু : জেলার জলবায়ু নাতিশীতোষ্ণ। কেননা এখানে গ্রীষ্মকাল যেমন শুষ্ক ও উষ্ণ, শীতকাল তেমনি ঠাণ্ডা। মধ্য এপ্রিল থেকে মধ্য জুন পর্যন্ত গ্রীষ্মকাল। জেলার সবনিম্ন ও সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ১০° সে.গ্রে. থেকে ৩৭.৬° সে.গ্রে. পর্যন্ত ওঠানামা করে। গ্রীষ্মকালে বাতাসের আর্দ্রতা ৭১% এবং বর্ষায় তা ৮৭%। জেলার বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ১,৭৫২ মি.মি.। যশোর জেলায় আবহাওয়া তথ্য স্টেশনটি অবস্থিত। বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর-এর অধীনে এই স্টেশনে আবহাওয়ার পূর্বাভাস, তথ্য ও উপাত্ত প্রদান করা হয় ।

উদ্ভিদ ও জীব বৈচিত্র্য : জেলায় কোন সংগঠিত বনায়ন নেই। কিন্তু প্রায় প্রতিটি ঘরের ভিটেমাটি বিভিন্ন ধরনের গাছ-গাছালিপূর্ণ। জেলার ভিটেমাটি, বাঁধ ও পরিত্যক্ত এলাকায় বিভিন্ন ধরনের ফলজ গাছ-গাছালি, গুল্ম ও বাঁশ গাছ দেখা যায়।

ফলজ গাছের মধ্যে সফেদা, কদবেল, সুপারি, নারিকেল, কাঁঠাল, ও খেজুরই প্রধান। ঘর-গৃহস্থালির চারদিকে প্রধানত আম, কালোজাম, সুপারি, নারিকেল, জামবুড়া, সফেদা, খেঁজুর, কাঁঠাল ও কদবেল গাছ দেখা যায়। ঔষধি গাছের মধ্যে সাজনা, লটকন, নাগেশ্বর উল্লেখযোগ্য। রাস্তার দু'ধারের বা Way side গাছগাছালির মধ্যে বাবলা, রেইনট্রি, নিম, বট, তেঁতুল, অর্জুন, কাঠবাদাম, তাল আর পলাশের সারি চোখে পড়ে।

যশোর জেলা পুকুর, জলাভূমি, বিল ও বাওড় এলাকার জন্য স্বতন্ত্র। তাই এই জেলা জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণী বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ। জলজ উদ্ভিদের মধ্যে সোলা, ব্রহ্মীশাক, কচুরিপানা, হেলেঞ্চা, খুদিপানা, কলমিশাক, সিংগারা, কাঠ-শোলা, শাপলা, পদ্ম, কেশরদাম, শৈবাল ইত্যাদি অন্যতম। ঘরবাড়ির আঙিনায় বিভিন্ন ফুলগাছ যেমন কামিনী, গন্ধরাজ, দোলন চাঁপা, শেফালী, বেলী, জবা, হলদে করবী, টগর ইত্যাদি দেখা যায়।

উদ্ভিদ বৈচিত্র্য	
ফলজ গাছ	আম, সফেদা, কদবেল, সুপারি, নারিকেল, কাঁঠাল, নাগেশ্বর ও খেজুর
কাষ্ঠল গাছ	তেতুল, জারুল, কড়ই, তাল, গর্জন
বনজ গাছ	কার্পাস, মান্দার, কদম, তেঁতুল, হিজল, পলাশ ও হাতিম
ঔষধি গাছ	সাজনা, লটকন, নাগেশ্বর
রাস্তার দু'ধারের গাছ	বাবলা, রেইনট্রি, নিম, বট, অশুত্থ, তেঁতুল, অর্জুন, কাঠবাদাম
জলজ উদ্ভিদ	সোলা, ব্রহ্মীশাক, কচুরিপানা, হেলেঞ্চা, খুদিপানা, কলমিশাক, সিংগারা, কাঠ-শোলা, শাপলা, পদ্ম, কেশরদাম, শৈবাল
প্রাণী বৈচিত্র্য	
প্রাণী প্রজাতি	বেঁজি, বড় বেজি, সজারু, ইঁদুর, মেঠো ইঁদুর, শিয়াল, বন বিড়াল
সরীসৃপ প্রাণী	টিকটিকি, গুই সাপ, ঢোড়া সাপ, জাতি সাপ, দাঁড়াশ, ব্যঙ
পাখি প্রজাতি	স্থানীয় পাখি, অতিথি পাখি

বেঁজি, বড় বেজি, সজারু, ইঁদুর, মেঠো ইঁদুর, শিয়াল, বন বিড়াল ইত্যাদি প্রধান স্তন্যপায়ী প্রাণী। তবে জেলার কোথাও কোথাও শুশুক, খেঁকশিয়াল, খাটাশ ও বাঘ খান্ডাশ এখনো দেখা যায়। দক্ষিণের কোন কোন নদীতে হঠাৎ মেছো কুমির দেখা যায়। উল্লেখ্য, একসময় গড়াই, মধুমতি, ভৈরব ও ইছামতি নদীতে বর্ষায় বহু কুমির দেখা যেত। এমনকি গত শতাব্দীতে এ নদীগুলোতে সচরাচর শুশুক দেখা যেত।

স্থানীয় পাখিদের মধ্যে দোয়েল, চড়ুই, টুনটুনি, পানকৌড়ি, টিলামুনিয়া, বাবুই, মৌটুশি, বুলবুলি, ঝুঁটি শালিক, কালিপেঁচা, হলদেপাখি, কাঠঠোকরা, বনস্পতি, লক্ষ্মীপেচাঁ, ঘুঘু, ডাহুক, ছোট হরিয়াল, কুড়া, লালচিল, বেলে হাঁস ও বক অন্যতম। জেলার বিল ও বাওড় এলাকায় শীতকালে অতিথি পাখিরা ভিড় জমায়। রাজহাঁস, পাতারি হাঁস, লেনজা হাঁস, গিরিয়া হাঁস, বাদামি খোসাই পাখি, সাদা খঞ্জনী উল্লেখযোগ্য প্রধান কয়টি অভিবাসী পাখি।
যশোরে সরীসৃপ প্রাণী বলতে টিকটিকি, গুই সাপ, ঢোঁড়া সাপ, জাতি সাপ এবং দাঁড়াশ সাপ প্রধান। উভচর প্রাণী বলতে প্রধানত কটকটি ব্যাঙ, ভাওয়া ব্যাঙ ও ঝিঁঝিঁ ব্যাঙকে বোঝানো হয়।

নদী-নালার মাছ : জেলার নদী-নালা, ধানক্ষেতে বহু প্রজাতির মাছ পাওয়া যায়, যা মাছের প্রাকৃতিক আবাসভূমি হিসেবে পরিচিত। জেলার বিল, বাঁওড়, পুকুর ও নদী নালায় বিভিন্ন প্রজাতির মাছ দেখা যায়। মিঠাপানির মাছ বলতে রুই, কাতল, মৃগেল, কালি বাউশ, আইর, বোয়াল, মাগুর, শিং, কই, শোল, পাবদা, চিতল, সরপুটি, মাছই প্রধান হয়। নাইলোটিকা, তিলাপিয়া, কার্প প্রধান কয়টি বিদেশী জাতের মাছ। জেলার পুকুরগুলোতে এই মাছের নিবিড় চাষ করা হয়।

বিল-বাওড় ও নদী-নালার মাছ :	রুই, কাতল, মৃগেল, কালি বাউশ, আইর বোয়াল, মাগুর, শিং, কই, শোল, পাবদা, চিতল, সরপুটি, মাছ
বিদেশী জাতের মাছ :	নাইলোটিকা, তিলাপিয়া, কার্প
পুকুরের মাছ :	রুই, কাতলা, মৃগেল, কালিবাউশ, শিং, মাগুর, বাইন, পুঁটি, গলদা চিংড়ি

পুকুরে প্রধানত রুই, কাতল, মৃগেল, কালিবাউশ, শিং, মাগুর, বাইন, পুঁটি, গলদা চিংড়ির চাষ করা হয়। দক্ষিণের বিল ও বাওড়ে প্রাকৃতিক উপায়ে মাছের চাষ হয়। জেলার মধ্যাঞ্চল দিয়ে বয়ে যাওয়া ইছামতি, মধুমতি, চিত্রা ও নবগঙ্গায় এখনও কিছু ইলিশ ধরা পড়ে। তবে, যশোর জেলার মধ্যাঞ্চলে পুকুর জলাশয়ের অভাবে মাছের উৎপাদন কম। জেলায় বেসরকারি উদ্যোগে বহু মাছের খামার ও মাছের পোনা উৎপাদনকারী খামার গড়ে উঠেছে। সাধারণত অক্টোবর থেকে মার্চ মাস পর্যন্ত মাছ ধরা হয়। কেননা এই সময়ে জেলার নিম্নাঞ্চল বন্যার পানিতে ডুবে থাকে।

বনভূমি : যশোর জেলায় তেমন কোন সংঘঠিত বন নেই। তবে জেলায় কিছু মূল্যবান বনজ ও কাষ্ঠল গাছ চোখে পড়ে। বাঁধের দুই পাশে, রাস্তার ধারে স্থানীয় ও বনবিভাগের উদ্যোগে কমবেশি কিছু গাছ লাগান হয়েছে। জেলার উদ্ভিদ বৈচিত্র্যে বিশেষ মাত্রা যোগ করেছে ঘর গেরস্থালির ফলজ ও বনজ গাছের বাগান।

কৃষি সম্পদ

কৃষি জমি : জেলার মোট কৃষি জমির পরিমাণ ১,৬৭,৩২১ হে. (কৃষি অধিদপ্তর, ২০০১)। এর মধ্যে ৮০% জমিতে সেচ দেয়া হয়। ভূ-উপরিস্থিত পানির সাহায্যে সেচ দেয়া হয় ২% জমিতে এবং ৭৮% জমি সেচের জন্য ভূ-গর্ভস্থ পানির উপর নির্ভরশীল।

কৃষি জমি	১,৬৭,৩২১ হে.
সেচের জমি	১,৫৩,৮৭২ হে.
শস্য নিবিড়তা	১৮৩

প্রধান ফসল : যশোর জেলা কৃষি প্রধান অঞ্চল। জেলার অর্থনীতি কৃষিনির্ভর। জেলার মোট ৭১% গৃহস্থালি কৃষি নির্ভর। জেলার মাটি ও আবহাওয়া নানা ধরনের ফসল, রবিশস্য, তৈলবীজ, সবজি উৎপাদনের উপযোগী।

এখানে প্রচুর পরিমাণে ধান (স্থানীয় ও উফসী), গম, আলু, সবজি, মরিচ, পিঁয়াজ, রসুন, পাট, ডাল, আখ, তৈলবীজ, পান ও অন্যান্য উৎপাদিত হয়। জেলায় প্রচুরসংখ্যক খেজুর গাছ রয়েছে। যশোর জেলা খেজুরের রস ও গুড়ের জন্য বিখ্যাত। বাংলাদেশের তিন ভাগের দুই ভাগ তুলার চাষ হয় যশোর জেলায়। প্রচুর পরিমাণে তামাক ও পানের চাষ হয়। উল্লেখ্য,

প্রধান অর্থকরী ফসল	পাট, খেজুর, আম, ধান, আখ, রজনীগন্ধা, সবজি ও পান
প্রধান ফসল	ধান (স্থানীয় ও উফসী), গম, আলু, সবজি, মরিচ, পিয়াজ, রসুন, পাট, ডাল, আখ, তৈলবীজ, পান
রপ্তানী ফসল	তুলা, পাট, চামড়া, কাঠাল, কলা, খেজুর গুড়, সবজি

স্থানীয় প্রজাতির ধান ও তামাকের চাষ আজ প্রায় বিলুপ্ত হতে চলেছে।

জেলার প্রধান অর্থকরী ফসল পাট এবং গুরুত্বপূর্ণ অর্থকরী ফসল ধান, পাট, আখ, সবজি ও রজনীগন্ধা । তুলা, পাট, চামড়া, কাঁঠাল, কলা, খেজুর গুড়, সবজি প্রধান রপ্তানী ফসল ও পণ্য দ্রব্য। খেজুর, কাঁঠাল, পেপে, কলা, লিচু ও নারিকেল প্রধান ফল।

কৃষিজ ফসলের মধ্যে ধানই প্রধান। জেলায় আমন ধানের চাষ হয় সবচেয়ে বেশি এবং এর পরে বোরো ও আউশের স্থান। বিল এলাকায় আউশের সাথে আমন ও চাষ করা হয়। জেলায় বিভিন্ন প্রজাতির আমন ধানের চাষ হয়। এর মধ্যে দুধমনি, গঞ্জকস্তুরী, মালভোগ, কালমেঘ, ঝিংগাশাল, কার্তিকশাল, বশিরাজ, দাহরনাগরা, তালকটুর নাম উল্লেখযোগ্য। গম ও বোরো চাষে নলকূপের সাহায্যে সেচ দেয়া হয়।

গত ১৯৯৮-৯৯ সালে উৎপাদিত খাদ্য শস্যের পরিমাণ

খাদ্য শস্য	জমি (হে.)	উৎপাদন (মে.টন)
গম	৬৮,৩৫৮	১,৫২,২৪০
ডাল	৭৯,৭১৫	৭২,৩৬০
তৈলবীজ	৬৯,৭৭৭	৫৩,৯৩৫
আম	১৩,৫৩৩	৫,৩৪,৩২৫
পাট	৪৭,৬৫০	৫,০৩,১৮০
তুলা	২,৫৪৮	৬,২২৫
সুপারি	১,৪৮৫	১,১৭৫
পান	১,২৪৬	৭,০০০
সবজি	৭,৩৯৮	৪৩,৪৭৫
শীতকালীন সবজি	১০,২১৯	৮২,৩১৫
অন্যান্য শীতকালীন সবজি	১০,৬৩১	১,৪৬,০০০

জেলার পশ্চিমে উর্বর মাটিতে মশুর, উত্তর-পশ্চিমে এবং দক্ষিণে মুগ ডালের ব্যাপক চাষ হয়। জেলার দক্ষিণে বরিশাল থেকে আগত চাষীরা এইসব শস্য উৎপাদনের কাজে নিয়োজিত। অভয়নগরে নারিকেলের সাথে সাথে সুপারি বাগানও করা হয়। সমগ্র যশোর জেলা বিশেষ করে উত্তর-পশ্চিমাংশের লোকেরা ফসল চাষের মত খেজুর গুড় উৎপাদনের উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল। গত ১৯৯৮-৯৯ সালে উৎপাদিত খাদ্য শস্যের পরিমাণ পাশের সারণীতে দেখানো হলো।

ফুল চাষ : আশির দশকের শুরুতে ঝিকরগাছা উপজেলার পানিসারা গ্রামের জনৈক তরুণ আলী সর্দার সীমান্ত বর্ডার দিয়ে রজনীগন্ধার আঁটি পাচার হওয়া দেখে নিজে উদ্বুদ্ধ হয়ে আধা বিঘা জমিতে রজনীগন্ধার চাষ শুরু করেন। সেই থেকে জেলায় রজনীগন্ধার বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু হয়। বর্তমানে জেলার শার্শা ও ঝিকরগাছা উপজেলায় ৫,০০০ জনের প্রধান পেশা বাণিজ্যিকভাবে ফুলের চাষ। এখন রজনীগন্ধার পাশাপাশি নানা প্রজাতির গোলাপ, গাঁদা ও নানা মৌসুমী ফুল চাষ করা হচ্ছে। একজন ফুলচাষী এক বিঘা জমি থেকে এক মৌসুমে এক লাখ টাকা আয়ে সক্ষম। এটি অত্যন্ত লাভজনক কৃষিতে পরিণত হয়েছে।

রেণু ও পোনা উৎপাদন : যশোর জেলায় ছোট বড় হ্যাচারীগুলোতে রেণু ও পোনার বাণিজ্যিক উৎপাদন অব্যাহত রয়েছে। সমগ্র উপকূল অঞ্চলের মধ্যে যশোর জেলা বিভিন্ন প্রজাতির মাছের রেণু ও পোনা উৎপাদন ও সরবরাহে এগিয়ে আছে। প্রতি বছর শ্রাবণ-ভাদ্র মাস পর্যন্ত যশোর শহর ও শহর সংলগ্ন চাঁচড়ার কয়েক কি.মি. এলাকা জুড়ে পোনা বিক্রির হাট বসে। প্রতিদিন ভোর থেকে বেলা ১০-১১টা পর্যন্ত গড়ে ৩ থেকে ৪ হাজার কেজি বিভিন্ন ধরনের মাছের পোনা বিক্রি হয়। বৃহত্তর বরিশাল, ফরিদপুর, কুষ্টিয়া ও খুলনা জেলার মাছ চাষীরা যশোর জেলায় পোনা কিনতে আসেন। এই হাটগুলোতে রুই, কাতল, মৃগেল, সিলভার কার্প, গ্রাস কার্প, মিরর কার্প, মিনার কার্প, জাপানি রুই, পাঙ্গাশ, থাই সরপুঁটি, আফ্রিকান ব্ল্যাক কার্প মাছের পোনা বিক্রি করা হয়।

এর পাশাপাশি এসব প্রজাতির মাছের রেণুও বিক্রি হয়। সাধারণত ঢাকা, বরিশাল, ভোলা, পাবনা, পটুয়াখালী, ফরিদপুর, শরিয়তপুর, খুলনাসহ বিভিন্ন জেলার নার্সারি মালিকরা এখান থেকে অক্সিজেন ব্যাগে এসব রেণু পোনা নিয়ে যান। উল্লেখ, রেণু ও পোনা বিক্রির এ হাটকে কেন্দ্র করে নানা ধরনের ব্যবসা জমে ওঠে। এর মধ্যে হোটেল রেস্তোরাঁ, পরিবহন, পোনা নেয়ার জন্য ব্যবহৃত ব্যারেল ও হাঁড়ি- প্লাস্টিকের বস্তা, জাল, শিঁকে-র ব্যবসা অন্যতম।

এ ছাড়া বিপুলসংখ্যক দরিদ্র লোক পোনা পরিবহনের সময় পোনা থাপানোর কাজ করে থাকেন। মাছের পোনা ব্যবসায়ীরা স্বল্প মজুরিতে এদের নিয়োগ করেন।

পান চাষ : লোহাগড়া, কেশবপুর, অভয়নগর, নওয়াপাড়া এবং ভৈরব নদীর পার্শ্ববর্তী গ্রামে পানের বরজের সংখ্যা বেশি। উল্লেখ্য, পান চাষের সাথে যুক্ত পরিবারকে 'বারুই' পরিবার বলা হয় ।

মৎস্য সম্পদ : যশোর জেলা মাছের দিক থেকে বৈচিত্র্যপূর্ণ। কৃষি ক্ষেত্রে জেলার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হল মাছের প্রাচুর্য্য। খাল-বিল, বাঁওড়, পুকুর, দীঘি, ডোবা ও অন্যান্য জলাশয়ে সারা বছর ধরে এবং বিশেষ করে নদী-নালা, খাঁড়ি ও ধানক্ষেতে বর্ষাকালে প্রচুর পরিমাণে নানা প্রজাতির মাছ ধরা হয়। সাধারণত অক্টোবর থেকে মার্চ মাস পর্যন্ত মাছ ধরা হয়। কেননা এই সময়ে জেলার নিম্নাঞ্চল বন্যার পানিতে ডুবে থাকে।

জলাভূমি	উৎপাদন (মে.টন)
বন্যাপ্লাবন ভূমি	৬,১৩৭
বিল	২,২৪১
বাওড়	২,০৪৫
নদী-মোহনা	১৩৬
মোট	১০,৫৫৯

২০০১-২০০২ সালে জেলায় মোট ১০,৫৫৯ মে. টন মাছ ধরা হয় এবং তা সমগ্র উপকূলীয় অঞ্চল (২,৫১,৯৯৯ মে. টন) এবং বাংলাদেশ (৬,৮৫,০৮০ মে. টন) এর পরিমাণের তুলনায় যথাক্রমে ৪% এবং ১.৫% (মৎস্য অধিদপ্তর, ২০০৩)। উল্লেখ্য, এর মধ্যে নদী-মোহনায় ১৩৬ মে. টন, বন্যাপ্লাবন এলাকায় ৬,১৩৭ মে. টন, বিল এলাকায় ২,২৪১ মে. টন ও বাওড় এলাকায় ২,০৪৫ মে. টন মাছ ধরা হয়।

মৎস্য অভয়ারণ্য : মৎস্য অধিদপ্তর ইতিমধ্যে যশোর জেলায় দুটো মৎস্য অভয়ারণ্য স্থাপনের প্রস্তাবনা রেখেছে (চতুর্থ মৎস্য প্রকল্প, ১৯৯৯)। এর আওতায় কেশবপুর ও মণিরামপুরের প্রধান দুটি বিল - খুকশিয়া ও কাপাশিয়াতে পরিকল্পনা মাফিক এই অভয়ারণ্য গড়ে তোলা হবে।

সম্ভাব্য মৎস্য অভয়ারণ্য		
উপজেলা	জলাশয়	এলাকা (হে.)
কেশবপুর	বিল খুকশিয়া	৮৫০
মণিরামপুর	বিল কাপাসিয়া	২২৫

চিংড়ি : যশোর জেলায় চিংড়ি চাষের বিস্তার শুরু হয়েছে। খাল কেটে ঘেরের জমিতে লোনা পানি প্রবেশ করিয়ে বাগদা'র চাষ করা হচ্ছে। জেলায় চিংড়ি চাষের প্রসারের তথ্য বিশ্লেষণে জানা যায় যে, বর্তমানে যশোর জেলায় চিংড়ি চাষ ও ধানক্ষেতে মাছ চাষ দুটোই ব্যাপকভাবে প্রচলিত। উল্লেখ্য, এখানে চিংড়ি ঘেরের আইলে সবজি চাষের প্রচলন শুরু হয়েছে।

সাল	চিংড়ি ঘের (গলদা ও বাগদা)	উৎপাদন
১৯৯৬-৯৭	৩৪৪ হে.	৭২ মে.টন
২০০০-২০০১	৮৯৫ হে.	২০৯ মে.টন

মৎস্য অধিদপ্তরের হিসাব (২০০৩) অনুযায়ী গত ২০০০-২০০১ সালে জেলায় মোট ৮৯৫ হে. চিংড়ি (গলদা ও বাগদা) ঘের থেকে মোট ২০৯ মে. টন চিংড়ি উৎপাদিত হয়। উল্লেখ্য, ১৯৯৬-৯৭ সালে চিংড়ি চাষের জমির পরিমাণ ছিল ৩৪৪ হে. এবং তা থেকে প্রায় ৭২ মে. টন চিংড়ি উৎপাদিত হয়। এই হিসাব দেখায় যে, যশোর জেলায় চিংড়ি চাষের জমি এবং উৎপাদনের পরিমাণও বেড়েছে। মাঠ পর্যায়ের গবেষণা (২০০২), বিপদাপন্নতা সমীক্ষা (২০০৩) এবং পেশাজীবীদের সাথে মতবিনিময় সভা থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী জেলায় চিংড়ি ঘেরের জমি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। তবে, সেই অনুপাতে চিংড়ি চাষীদের অজ্ঞানতা ও কৌশলগত

ত্রুটি, মাছের রোগ, বিনিয়োগের অভাবের কারণে চিংড়ি চাষী আশানুরূপ উৎপাদনে ব্যর্থ হচ্ছেন।

পশু সম্পদ : কৃষি শুমারী ১৯৯৬ অনুসারে যশোর জেলার গ্রামীণ এলাকায় মোট ২,২৪,৫৫২টি গৃহের গবাদিপশু রয়েছে, যা মোট গ্রামীণ গৃহস্থালির ৫৭% এবং গৃহস্থালিগুলোর মোট গবাদিপশুর সংখ্যা ৬,০৪,৭৬৯। অর্থাৎ প্রতিটি ঘরে গড়ে ৩টি করে গবাদিপশু রয়েছে। এ ছাড়া গ্রামীণ গৃহস্থের মোট হাঁস-মুরগীর সংখ্যা ৩১,২৬,৯৮২ এবং ঘর প্রতি গড়ে ৮টি করে হাঁস-মুরগী রয়েছে। এ ছাড়া জেলায় মোট ১৩২টি পশু সম্পদ খামার এবং ১,০৬৪টি হাঁস-মুরগী খামার রয়েছে (বাংলা পিডিয়া, ২০০৩) ।

মোট গবাদিপশু র সংখ্যা	৬,০৪,৭৬৯টি
ঘর প্রতি গবাদিপশু (গড়)	৩টি
মোট হাঁস-মুরগির সংখ্যা	৩১,২৬,৯৮২টি
ঘর প্রতি হাঁস-মুরগি (গড়)	৮টি

দুর্যোগ

প্রাকৃতিক দুর্যোগের দিক থেকে যশোর জেলার পরিস্থিতি একটু ভিন্ন। কেননা জেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত নদ-নদীগুলো অসংখ্যবার খাত পরিবর্তন করেছে। ফলে সৃষ্টি হয়েছে অসংখ্য বিল ও বাঁওড়। অতীতের প্রমত্তা নদীগুলো ক্ষীণ ধারায় পরিণত হয়েছে। ফলে উজানের পানি নিরসনে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হচ্ছে। আর তাই নদী ভরাট, জলাবদ্ধতা, লবণাক্ততা ও বন্যা জেলার প্রধান কয়টি দুর্যোগ হিসেবে চিহ্নিত। এর সাথে যুক্ত হয়েছে আর্সেনিক দূষণ। এ ছাড়াও মানুষের কাজকর্ম, অসচেতনতা, দারিদ্র্য ইত্যাদি কারণে সৃষ্ট পরিবেশগত সমস্যা বা দুর্যোগ তো রয়েছেই।

নদী ভরাট : ভারতে গঙ্গার উপর নির্মিত ফারাক্কা বাঁধের কারণে পদ্মা নদী ও তার শাখা নদী, উপ নদীগুলো দ্রুত পলি জমে ভরাট হয়ে যাচ্ছে। তাই যশোরের মধ্য দিয়ে বয়ে যাওয়া মধুমতি, নবগঙ্গা, ইছামতি, ভৈরব, আপার ভৈরব, চিত্রা, কপোতাক্ষ, বেতনা ও ভদ্রা নদী আজ তাদের প্রাকৃতিক পানি প্রবাহ হারাতে বসেছে। পলি ভরাট ও নাব্যতা হ্রাসের কারণে নদীগুলো কোন কোন অংশে শুকিয়ে গেছে। ফলশ্রুতিতে, জেলায় মাছের উৎপাদন ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়েছে। এ ছাড়া অপরিকল্পিত ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ ও নদী শাসন ব্যবস্থা এবং জটিল পানি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির কারণে জেলার নদ-নদীগুলোতে পলির অবক্ষেপণ বাড়ছে। তাই পলি পড়ে নদীগুলো অকালে ভরাট হয়ে যাচ্ছে। ফলে জেলার পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা দিন দিন ভয়াবহ রূপ ধারণ করছে। নদীগুলো তাদের নাব্যতা হারিয়ে অনুকূল প্রাকৃতিক প্রতিবেশ ও ভারসাম্য নষ্ট করছে এবং শহর, গ্রাম ও জনপদের মানুষকে বিপদাপন্ন করে তুলছে।

জলাবদ্ধতা : পুরো যশোরই হয় আঞ্চলিক অথবা স্থানীয় জলাবদ্ধতার শিকার। নদী-নালা ও খাল-বিল পলিতে ভরাট হয়ে যাওয়া, নদীর ভাটিতে সঞ্চিত পানির পরিমাণ কমে যাওয়া, অপরিকল্পিত বসতি স্থাপন, কৃষি জমির অভাব, পোল্ডার নির্মাণ, অপরিকল্পিত পানি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি, দুর্বল নিষ্কাশন ব্যবস্থা, অপরিকল্পিত মাছের ঘের, নদী-খালে আড়াআড়ি বাঁধ নির্মাণ, কচুরীপানা, পুকুর-খাল মজে যাওয়া, নদী-শাখা নদীতে স্থানীয় প্রভাবশালীদের অলিখিতভাবে ইজারা নিয়ে ভোগদখল ইত্যাদির কারণে জলাবদ্ধতার সমস্যা দিন দিন প্রকট হয়ে স্থায়ী রূপ নিচ্ছে। বিশেষ করে জেলার গ্রামাঞ্চলে জলাবদ্ধতা একটি গুরুতর দুর্যোগ। অগভীর

কপোতাক্ষ নদের দু'কূল উপচানো জোয়ারের পানি থেকে নদী তীরবর্তী মণিরামপুর, কেশবপুর ও ঝিকরগাছা উপজেলায় জলাবদ্ধতা স্থায়ী রূপ নিয়েছে। কেশবপুর উপজেলার বিদ্যানন্দকাঠি, সাগরদাঁড়ি, ত্রিমোহনী, মেহেরপুর, বাসবাড়িয়া, বরণডালি, গোপসেনা, সরসকাঠি, মীরেরডাঙ্গা গ্রাম, মণিরামপুর উপজেলার দিয়াড়া, কাঁঠালতলা, চাকলা, কাঁপা, ভরতপুর, পশ্চিমনগর, চালিয়াহাটি, চাঁপাতলা গ্রামসহ ঝিকরগাছা উপজেলার বাঁকড়া, শিমুলিয়া গ্রামে সৃষ্টি হয়েছে দীর্ঘস্থায়ী জলাবদ্ধতা।

বন্যা : বৃহত্তর যশোর জেলার একটি অন্যতম প্রাকৃতিক দুর্যোগ হল বন্যা। বর্ষায় পদ্মা ও তার শাখা নদীগুলোর উপচে পড়া পানি একসময় যশোর জেলায় বন্যার অন্যতম কারণ ছিল। তবে বর্তমানে জেলার উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে নদীবাহিত পলির কারণে প্রতিবছরই কোন না কোন অঞ্চল বন্যায় প্লাবিত হয়। এ ছাড়া অতিবর্ষণের ফলে বন্যার সৃষ্টি হয়। নদ-নদীগুলো ভরাট হয়ে যাবার কারণে ভাটি অঞ্চলে ব্যাপক বন্যা দেখা দেয়।

সাল	বন্যাকবলিত এলাকা	ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ
১৮৮৫	৪০০ বর্গ মাইল এলাকা	আমনধানের ব্যাপক ক্ষতি, রেল ও সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন
১৮৯০	সদর উপজেলা	আমন ও আউশের ব্যাপক ক্ষতি
১৯৬৮	প্রায় সব কয়টি উপজেলা	আখ, পাট, আমন, আউশ ফসলহানি
১৯৭০	সদর মনিরামপুর ও অভয়নগর কেশবপুর	খাদ্যশস্য, নলকূপ ও ঘরবাড়ির ব্যাপক ক্ষতি, উচ্চ আমন নষ্ট

আর্সেনিক দূষণ : বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, প্রতি লিটার পানিতে আর্সেনিকের গ্রহণযোগ্য সর্বোচ্চ মাত্রা ০.০১ মি. গ্রা.। কিন্তু বাংলাদেশে এর পরিমাণ ০.০৫ মি. গ্রা/লি.। যশোর জেলায় পানিতে আর্সেনিকের পরিমাণ সহনীয় মাত্রার চেয়ে অনেকগুণ বেশি। জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (২০০১)-এর তথ্যানুসারে জেলায় গভীর নলকূপের পানিতে আর্সেনিকের মাত্রা ৭০ মি.গ্রা./লি. এবং জেলার প্রায় ৪৬% নলকূপে আর্সেনিকের মাত্রা ৫০ মি.গ্রা./লি. এর বেশি। ভূ-গর্ভস্থ পানির অত্যধিক আহরণে জেলায় আর্সেনিক দূষণ ক্রমশ বাড়ছে। তাই নিরাপদ পানির সংকট দিনদিন তীব্রতর হচ্ছে।

উল্লেখ্য, কেশবপুর উপজেলার খোশাবপুর ইউনিয়নের হিজলডাঙ্গা গ্রামের ১০০% নলকূপেই আর্সেনিক শনাক্ত করা হয়েছে (ম্যাস লাইন মিডিয়া সেন্টার, ২০০১)। এই গ্রামটিতে প্রতি ১,০০০ জনে গড়ে ৮ জন আর্সেনিক রোগী রয়েছে। অথচ কেশবপুর উপজেলার বিদ্যানন্দকাঠি ইউনিয়নের বাগা গ্রামে ১০০% নলকূপে আর্সেনিক থাকা সত্ত্বেও কোন চিহ্নিত রোগী নেই। কেননা এই গ্রামটিতে আর্সেনিক আক্রান্ত রোগীদের চিহ্নিত করার কোন উদ্যোগ নেয়া হয়নি। বিদ্যানন্দকাঠি ইউনিয়নের দক্ষিণ চান্দিপুর, উত্তর চান্দিপুর গ্রাম, সুগন্ধী, পশ্চিম চান্দিপুর গ্রাম এবং শার্শা উপজেলার গঙ্গানাথপুর ইউনিয়নের সাতমাইল গ্রামে অন্ততপক্ষে গড়ে ১০ জন করে আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত রোগী শনাক্ত করা হয়েছে।

যশোরে আর্সেনিক সমস্যা ভয়াবহ আকার ধারণ করছে। অজ্ঞানতা, তথ্যের অভাব, কুসংস্কারের কারণে আর্সেনিকে আক্রান্ত হওয়ার বিষয়টি আল্লাহর গজব হিসেবে চিহ্নিত হচ্ছে। মানুষ সামাজিকভাবে অস্পৃশ্য হয়ে পড়ছে। আক্রান্ত নারীদের বিয়ে দেয়া কষ্টকর হয়ে দাঁড়াচ্ছে, শ্বশুরবাড়ি থেকে তারা বিতারিত হচ্ছে।

ঘূর্ণিঝড় : ঘূর্ণিঝড় জেলার আর একটি প্রধান দুর্যোগ। ১৯৭০ সাল থেকে ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত যশোর জেলার উপর দিয়ে ১৫টি ছোট-বড় ঘূর্ণিঝড় বয়ে গেছে। এর মধ্যে ১৯৮৮ সালের ২৯শে নভেম্বরের ঘূর্ণিঝড়টি ছিল সবচেয়ে ভয়াবহ। কেননা এতে যশোরের ৬৪৭ বর্গ কি.মি. এলাকায় জানমালের ব্যাপক ক্ষতি হয়। ঘন্টায় ৭৪ কি.মি. বেগে

বয়ে যাওয়া ঝড়ো বাতাসে প্রায় ২২,৪৬০ একর জমির ফসল, ৭৮,০৭৩টি ঘর-বাড়ি, ৪৪৪টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মৃতের সংখ্যা দাঁড়ায় ৪৩ জনে।

নদী দূষণ : যশোরের প্রধান প্রধান নদীগুলো দূষণের শিকার। উদাহরণ হিসেবে ভৈরব নদীর কথা বলা যায়। নোয়াপাড়া ফুলতলা পয়েন্টে এই নদীর পানি মারাত্মকভাবে দূষিত হয়ে পড়ছে। স্থানীয় সূত্র মতে, নোয়াপাড়ায় ভৈরবের তীরে গড়ে ওঠা ২০টি শিল্প কারখানা ও ট্যানারি থেকে প্রতিদিন বিষাক্ত রাসায়নিক বর্জ্য নদীতে পড়ে। এ ছাড়া নদীর পার্শ্ববর্তী এলাকার বিল ও নালায় পাট জাগ দেয়ার ফলে পার্শ্ববর্তী নদীর পানি দূষিত হয়ে পড়ছে। স্থানীয় জেলেরা জানিয়েছেন, ইতিমধ্যে নদী দূষণের কারণে ভৈরব নদীর মাছের মড়ক শুরু হয়েছে। খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল ও পরিবেশবিদ্যা বিভাগের সূত্র অনুযায়ী, ভৈরবের ভাটির মাছ যেমন চিংড়ি, বেলে, চেওয়া ইত্যাদি পর্যাপ্ত অক্সিজেনের অভাবে এবং বিষাক্ত বর্জ্যের কারণে নানা রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। বিষাক্ত বর্জ্য নদীর মাছে অক্সিজেন সরবরাহে বিঘ্ন ঘটায়।

মাটি ও পানির লবণাক্ততা : মাটি ও পানির লবণাক্ততা যশোর জেলার একটি অন্যতম দুর্যোগ। উজানে গড়াই নদীতে শুকনো মৌসুমে পানির প্রবাহ কমে যাবার ফলে যশোরের ভূ-উপরিস্থ পানি ও মাটিতে লবণাক্ততা বেড়ে যায়। এসময় মাটির লবণাক্ততা <৪-৮ ডিএস/এম ও পানির লবণাক্ততা <১-২ ডিএস/এম পর্যন্ত ওঠানামা করে, যা স্বাভাবিক কৃষি ব্যবস্থা ও শিল্পে বিশুদ্ধ পানির ব্যবহারকে অনিশ্চিত করে। এতে একদিকে যেমন ফসলের ক্ষতি হচ্ছে, অন্যদিকে জমির সার্বিক উর্বরতা হ্রাস পাচ্ছে। অন্যদিকে নালার সাহায্যে চিংড়ি ঘেরে লোনা পানির প্রবেশ ঘটানোর ফলে ঘেরের জমিসহ আশপাশের ধান ক্ষেতের জমি লবণাক্ততায় আক্রান্ত হয়ে পড়ছে। পানিতে লবণ ও আয়রণের অতিরিক্ত পরিমাণ এই সংকটকে আরো বাড়িয়ে তুলছে।

বিশুদ্ধ পানির অভাব : এটি জেলার একটি অঞ্চলিক সমস্যা। গঙ্গার গতিপথ পরিবর্তন, মাথাভাঙ্গা নদীর মুখ ভরাট হওয়া, উপকূলীয় বাঁধ প্রকল্প, সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি ইত্যাদি আঞ্চলিক কারণ ও অপরিকল্পিতভাবে বাগদা চাষ, ভূ-গর্ভস্থ জলাধারের অভাব, আর্সেনিক দূষণ, প্রভৃতি স্থানীয় কারণে জেলার নিরাপদ পানির সংকট ক্রমশ তীব্র আকার ধারণ করেছে।

ভূ-গর্ভস্থ পানিতে অতিরিক্ত আয়রণের উপস্থিতি এই সংকটকে বাড়িয়ে তুলছে। আর তাই শুকনো মৌসুমে পুকুর অথবা বৃষ্টির পানিই প্রধান ভরসা। বিশুদ্ধ পানির অভাবে এখানকার মানুষ লবণাক্ত ও আর্সেনিকযুক্ত পানি পান করতে বাধ্য হয়। আর তাই গ্যাস্ট্রিক, পেটের পীড়া, আমাশয়, ডায়রিয়া, প্রজনন স্বাস্থ্যগত সমস্যাসহ শারীরিক দুর্বলতার শিকার এই এলাকার মানুষ।

সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি : মূলত সমগ্র বাংলাদেশই গাঙ্গেয় দ্বীপ হবার কারণে আজ এই হুমকির সম্মুখীন। গবেষণায় দেখা গেছে যে, গ্রীন হাউজ গ্যাসের প্রভাবে পৃথিবীর তাপমাত্রা বেড়ে চলেছে। যদি পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা ৩০ সে. বাড়ে তবে সমুদ্রের পানির উচ্চতা এক থেকে দেড় মিটার পর্যন্ত বাড়বে। ফলে দেশের উপকূল এলাকা ধ্বংস হয়ে যাবে। এই হিসাব থেকে যশোর জেলায় এর ভয়াবহ আশংকা সহজেই অনুমান করা যায়।

জলবায়ুর পরিবর্তন : জলবায়ুর পরিবর্তন জেলার আরেকটি সমস্যা। দৈনিক গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধি, আগাম বর্ষা বা অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, আকস্মিক বন্যা, প্লাবনসহ সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি ও বর্ষা মৌসুমের শেষে হঠাৎ অতিবৃষ্টি ইত্যাদি লক্ষণ জলবায়ু পরিবর্তনের ঈঙ্গিত বহন করে।

মাছের প্রজাতি হ্রাস : জেলায় মাছের প্রাচুর্য্য আজ আর আগের মতো নেই। নদী ভরাট, নদী দূষণ, নদীর খাত পরিবর্তন ও অনিয়ন্ত্রিত মাছ ধরা মাছের প্রজাতির হ্রাসের একটি প্রধান কারণ। অর্থাৎ মাছের প্রাকৃতিক আবাসভূমি না থাকায় জেলার বহু প্রজাতির মাছ আজ বিলুপ্ত হতে চলেছে।

জমি ডেবে যাওয়া : যশোর জেলায় জমি ডেবে যাচ্ছে, ফলে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের আশংকা রয়েছে। মূলত ১৯২৭ সাল থেকে তৎকালীন বৃহত্তর যশোর-খুলনা অঞ্চলের বিল ডাকাতিয়ায় জমি ডেবে যাওয়ার (Earth subsidence) প্রমাণ মেলে। জোয়ার-ভাটার নদীর বুকে অব্যাহত পলি সমন্বয়ের ফলে নদীর তলদেশ পার্শ্ববর্তী জমির তুলনায় ক্রমশ উঁচু হয়ে যাচ্ছে এবং আশপাশের জমি তলিয়ে যাচ্ছে। আর তাই জমি ডেবে যাওয়ার ফলে বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত হয়ে জলাবদ্ধতা দীর্ঘস্থায়ী রূপ নিচ্ছে।

বিপদাপন্নতা

বিপদাপন্নতা বলতে মানুষের জীবনে বিভিন্ন নেতিবাচক ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা এবং সেই নেতিবাচক ঘটনার সাথে মানুষের অভিযোজনের ক্ষমতাকে বুঝায়। বিপদাপন্নতার ধরণ, প্রকার ও ব্যপ্তিতে ভিন্নতা আছে। সব রকম বিপদাপন্নতা দ্বারা জেলার সব এলাকার পেশাজীবী ও সাধারণ মানুষ সমানভাবে আক্রান্ত হয় না। উপকূলীয় অঞ্চলের প্রধান জীবিকা দল ক্ষুদ্র কৃষক, জেলে, গ্রামীণ ও শহুরে শ্রমিকদের উপর পরিচালিত এক বিপদাপন্নতা সমীক্ষা (সিইজিআইএস, ২০০৪)-য় দেখা গেছে, যশোর জেলার ক্ষুদ্র কৃষকদের জীবনে প্রাকৃতিক ও অর্থনৈতিক বিপদাপন্নতার প্রভাব বেশি। জেলেরা মূলত প্রাকৃতিক দিক থেকে বেশি বিপদাপন্ন। তবে গ্রামীণ ও শহুরে মজুরি শ্রমিকদের বিপদাপন্নতার প্রেক্ষাপট ভিন্ন। গ্রামীণ শ্রমিকদের জীবনে সামাজিক ও প্রাকৃতিক বিপদাপন্নতার প্রভাব তুলনামূলকভাবে বেশি। অন্যদিকে, শহুরে শ্রমিকরা সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষিতে বেশি বিপদাপন্ন। যশোর জেলার ক্ষুদ্র কৃষকদের জীবনে প্রাকৃতিক ও অর্থনৈতিক বিপদাপন্নতার প্রভাব বেশি। জেলেরা মূলত প্রাকৃতিক দিক থেকে বেশি বিপদাপন্ন।

জীবিকাদল	বিপদাপন্নতা
ক্ষুদ্র কৃষক	জলাবদ্ধতা, আর্সেনিক, কৃষি উৎপাদন হ্রাস, খরা, উর্বরতা হ্রাস, কৃষি উপকরণের উচ্চ মূল্য, স্বাস্থ্যসেবার অভাব ইত্যাদি।
জেলে	মাছের উৎপাদন হ্রাস, মাছের রোগ, নদী ভরাট, আর্সেনিক ইত্যাদি।
গ্রামীণ মজুরি শ্রমিক	জমির অভাব, উজানের পানি হ্রাস, খরা, স্বাস্থ্য সেবার অভাব, নিম্ন মজুরি ইত্যাদি।
শহুরে শ্রমিক	যৌতুক, পয়ঃসমস্যা, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি, নিম্ন মজুরি, নদীর গতিপথ পরিবর্তন ইত্যাদি।

জীবন ও জীবিকা

জনসংখ্যা

মোট জনসংখ্যা ২৪.৬৯ লাখ, যার মধ্যে ১২.৮২ লাখ পুরুষ এবং ১১.৮৭ লাখ নারী (বি.বি.এস., ২০০১)। জেলার লিঙ্গ অনুপাত ১০০: ১০৮। মোট জনসংখ্যার ৮৩% গ্রামে বাস করে। যশোর মোটামুটি ঘনবসতিপূর্ণ জেলা। সমগ্র উপকূলীয় অঞ্চলে জনসংখ্যার ঘনত্বের বিচারে এই জেলার অবস্থান ৫ম স্থানে। প্রতি বর্গ কি. মি. ৯৬২ জন লোক বাস করে যা সমগ্র উপকূলীয় অঞ্চলে ৭৪৩ জন/ বর্গ কি. মি.। ০-১৪ ও ৬০$^{+}$ বছর বয়সী জনগণ ও ১৫-৫৯ বছর বয়সী জনগণের মধ্যে নির্ভরশীলতার অনুপাত ০.৭৩ (বি.বি.এস., ২০০১)। এই জেলার নবজাতক মৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ৫৫ এবং পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশু মৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ৮৪ (বি.বি.এস.- ইউনিসেফ, ২০০১)।

শহুরে জনগণ (লাখ)	৪.২৬
পুরুষ	২.২৮
নারী	১.৯৭
গ্রামীণ জনগণ (লাখ)	২০.৪৩
পুরুষ	১০.৫৩
নারী	৯.৮৯
লিঙ্গ অনুপাত	১০০: ১০৮
নির্ভরশীল জনগণের অনুপাত	০.৭৩
জনসংখ্যার ঘনত্ব (বর্গ কিঃমিঃ)	৯৬২
ঘনত্বের ক্রম (৬৪টি উপজেলার মধ্যে)	২২
নবজাতক মৃত্যুর হার	৫৫
<৫ মৃত্যুর হার	৮৪

পূর্বে জেলায় কিছু সংখ্যক নৃ-গোষ্ঠীর অবস্থান ছিল। W.W. Hunter ১৮৭৫ সালে উল্লেখ করেন, "জেলায় নৃ-গোষ্ঠীর মধ্যে অন্যতম ছিল গারো, খোল, সাঁওতাল এবং ধাঙর"। বর্তমানে এরা সংখ্যায় নগণ্য।

ঘর-গৃহস্থালি : যশোর জেলার শহরাঞ্চলে কম লোকের বসবাস লক্ষণীয়। শহুরে (০.৮৭ লাখ) ও গ্রামীণ (৪.৩৩ লাখ) মিলিয়ে যশোরে মোট গৃহস্থালির সংখ্যা ৫.২১ লাখ। প্রতিটি গৃহস্থ পরিবারে গড় জনসংখ্যা ৫ জন, যা সমগ্র উপকূলীয় অঞ্চলের তুলনায় কম। জীবিকার ধরনের উপর গৃহস্থালির ধরন নির্ভরশীল। ১৯৯৬ সালের কৃষি শুমারী অনুযায়ী জেলায় মোট ৪% নারী প্রধান গৃহস্থালি রয়েছে।

তবে সাধারণভাবে জেলার মানুষ অর্থনৈতিক দিক থেকে স্বচ্ছল। যশোর জেলার গ্রামগুলো অপেক্ষাকৃত বেশি ঘনবসতিপূর্ণ। সাধারণত উঁচু জমির উপর ঘনবসতির প্রবণতা বেশি এবং গ্রামীণ ঘরবাড়িগুলো মাটির ভিতের উপর প্রতিষ্ঠিত। জেলার নিম্নাঞ্চলে অবিন্যস্তভাবে ঘরবাড়িগুলো ছড়ানো। গ্রামাঞ্চলে ঘরের কাঠামো দেখেই একটি পরিবারের আর্থিক অবস্থা অনুমান করা যায়। ঘরের কাঠামোর বিবেচনায় ৮১% ঘরে পাকা দেয়াল এবং ৬০% ঘরে পাকা ছাদ আছে। ২০০১ সালের লোক গণনার প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী ৩৯% ঘরে বিদ্যুতের সংযোগ রয়েছে।

মোট গৃহস্থালির সংখ্যা	৫.২১ লাখ
শহুরে	০.৮৭ লাখ
গ্রামীণ	৪.৩৩ লাখ
গৃহ প্রতি গড় জনসংখ্যা	৫ জন
নারী প্রধান গৃহ (মোট গৃহস্থালির)	৪%

জনস্বাস্থ্য

যশোরের ইতিহাস পর্যালোচনায় জানা যায়, প্রাচীন কাল থেকেই যশোর অঞ্চলের পরিবেশ ছিল স্যাঁতস্যাঁতে ও অস্বাস্থ্যকর। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে নানা ধরনের রোগের প্রকোপও বৃদ্ধি পেতে থাকে। ফলে মৃত্যু হারও ক্রমশ বৃদ্ধি পায়। জনস্বাস্থ্য পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণে আনতে ১৮৬৭ সালে বেসরকারি উদ্যোগে যশোরে প্রথম হাসপাতাল তৈরি হয়। প্রথমদিকে টিনের চালা ঘরে কাজ চালানো হলেও পরের দিকে ঘুটিয়ার জমিদার পরিবারের কালীপদ

ঘোষ হাসপাতালটির পাকা ভবন নির্মাণ করেন। পরবর্তীতে ১৯২২ সালে ন্যাশনাল মেডিকেল স্কুল ও হাসপাতাল স্থাপিত হয়। বর্তমানে এটি অন্যতম চিকিৎসা কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। উল্লেখ্য, যশোরের প্রাচীনতম চিকিৎসালয় "লোহাগড়া পীতাম্বর ডিসপেন্সারী" প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯০৩ সালে। বিশিষ্ট আইনজীবী বাবু প্রফুল্ল কান্তি রায় এটি প্রতিষ্ঠা করেন।

যশোর জেলার আবহাওয়া সবসময় ভেজা ও দুর্যোগপূর্ণ ছিল। ১৮০০ সালে যশোর শহরের বর্ণনা দেয়া হয় এভাবে যে, "জঙ্গলী গাছপালা ও বাঁশে পরিপূর্ণ একটি শহর যার রাস্তাঘাট ও বাজার অস্বাস্থ্যকর গাছপালায় পরিপূর্ণ"। কিন্তু, ১৯২৫ সালের বন্দোবস্ত প্রতিবেদনে বলা হয়, "জেলার আবহাওয়ার উচ্চ আর্দ্রতা অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের জন্য দায়ী হতে পারে। কিন্তু, নদীগুলো ভরাট হয়ে যাওয়ায় প্রাকৃতিক নিষ্কাশন ব্যবস্থায় যে জটিলতার সৃষ্টি হয় তা জেলার পরিবেশকে স্যাঁতস্যাঁতে করে তোলে। ফলে মানুষ ম্যালেরিয়াসহ অন্যান্য রোগ বালাই-এ আক্রান্ত হয়"। তবে অভয়নগর উপজেলার পরিবেশ সেই সময়ে তুলনামূলকভাবে স্বাস্থ্যকর ছিল। ১৭৮৬ সাল পর্যন্ত যশোর জেলায় কোন সিভিল সার্জন ছিল না। ১৮৭১ সালে জেলায় ১১টি চ্যারিটি হাসপাতাল ছিল। স্থানীয় চাঁদা ও সরকারি সহায়তায় এগুলো চালু ছিল। ১৯৬৮ সালের জুলাই মাসে যশোর জেলায় পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম শুরু হয়।

জেলার জনসাধারণের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে ব্যাপক অবকাঠামোগত উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। বর্তমানে যশোর জেলায় ২টি সরকারি হাসপাতাল, ১৮টি বেসরকারি হাসপাতাল, ৭টি উপজেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং ২২টি গ্রামীণ ডিসপেন্সারি রয়েছে (বি.বি.এস., ২০০১)। জেলা সদরের সরকারি হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা মাত্র ৩৩০। অর্থাৎ মোট ৫,৪৭৯ জনের জন্য একটি হাসপাতাল (সরকারি) শয্যা রয়েছে, যা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। প্রতি বছর বর্ষার শুরুতে ও শেষে যশোর জেলায় ডায়রিয়ার প্রকোপ দেখা দেয়, গত বছরের মাঝামাঝি সময়ে ডায়রিয়া মহামারির আডেবে কার নেয়। মনিরামপুর উপজেলার ৭টি ইউনিয়নের অধিকাংশ গ্রামে ডায়রিয়া ছড়িয়ে পড়ে। এতে বেশি সংখ্যক ডায়রিয়া রোগীদের সামাল দিতে ব্যর্থ হয় জেলার সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতাল, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এবং গ্রামীণ ডিসপেন্সারিগুলো।

শিশু স্বাস্থ্য : যশোর জেলায় পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশু মৃত্যুহার প্রতি হাজারে ৮৪ জন এবং ১২-৫৯ মাস বয়সী শিশুদের মধ্যে ৭% শিশুই অপুষ্টির শিকার (বি.বি.এস.- ইউনিসেফ, ২০০১)।

>৫ বছরের কম শিশু মৃত্যুহার (প্রতি হাজারে)	৮৪
১২-৫৯ মাস বয়সী শিশু অপুষ্টির হার	৭%
আয়োডিনযুক্ত লবণ ব্যবহারকারী গৃহ	৭৫%

এই পরিসংখ্যানে আরো দেখা গেছে যে, হাম, ডিপিটি ও পোলিও রোগের টিকা নিয়েছে যথাক্রমে ৯০%, ৯১% ও ৯৮% শিশু। এ ছাড়া ৫৩% শিশু ORT নিয়েছে। ৭৫% গৃহ আয়োডিনযুক্ত লবণ ব্যবহার করে। জেলার জনগণের মধ্যে প্রধানত যেসব রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যায় তা হল সর্দি-জ্বর, ডায়রিয়া, আমাশয়, স্ক্যাবিস, ম্যালেরিয়া, নিউমোনিয়া ও পেপটিক আলসার ইত্যাদি।

পানি ও পয়ঃসুবিধা : যশোরে নিরাপদ পানির সংকট রয়েছে। আর্সেনিক দূষণের বিস্তার ও অপর্যাপ্ত পৌর পানি সুবিধা এর মূল কারণ। নিরাপদ পানির জন্য জেলার মোট গৃহস্থালির ৯৫% কল অথবা নলকূপের পানি ব্যবহার করে। বাকী ৫% অন্যান্য উৎস থেকে পানি সংগ্রহ করে চাহিদা পূরণ করে। উল্লেখ্য, যশোর জেলার ৮১% নলকূপেই আর্সেনিকের দূষণ পরীক্ষা করা হয়নি এবং মোট জনসংখ্যার মাত্র ৫৪% মানুষ

স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানাসহ গৃহ	৩৭%
অন্যান্য সুবিধাসহ গৃহ	৪১%
পায়খানার সুবিধাবিহীন গৃহ	২২%
কল বা নলকূপের উপর নির্ভরশীল গৃহ	৯৫%

আর্সেনিক বিষক্রিয়ার কথা শুনেছেন (বি.বি.এস.- ইউনিসেফ, ২০০১)। BGS/জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের হিসাব অনুসারে (২০০১) যশোরের নলকূপের প্রতি ১ লিটার পানিতে আর্সেনিকের গড় মাত্রা ৭০ মাইক্রোগ্রাম, যা সহনীয় মাত্রার চেয়ে অনেক বেশি। যশোর জেলার গ্রামীণ এলাকায় ১১৫ জন লোকের জন্য একটি করে সক্রিয় টিউবওয়েল রয়েছে এবং প্রতি বর্গ কি. মি.-এ সক্রিয় টিউবওয়েলের সংখ্যা মোট ৮টি (জ.প্র.অ, ২০০৩)। জেলার নলকূপগুলোর মধ্যে ২% বিকল অবস্থায় পড়ে আছে।

গ্রামীণ পয়ঃঅবস্থার চিত্র সন্তোষজনক নয়। জেলায় মাত্র ৩৭% ঘরে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা রয়েছে এবং ৪১% ঘরে কাঁচা পায়খানা রয়েছে। এ ছাড়া ২২% ঘরে কোন রকম কাঁচা বা পাকা পায়খানার সুবিধা নেই।

শিক্ষা

যশোর জেলায় একসময় বৃত্তিনির্ভর শিক্ষা ব্যবস্থার প্রচলন ছিল অর্থ্যাৎ পাঠ্যপুস্তক নয় বরং, প্রত্যেকে তাদের নিজ বৃত্তি অনুসারে সন্তানদের শিক্ষা দিত। তবে সুলতানী আমলে মুসলমানদের স্বতন্ত্র শিক্ষা ব্যবস্থা অর্থ্যাৎ মসজিদকেন্দ্রিক আরবী, ফরাসী ভাষা-সাহিত্যে শিক্ষাদান পদ্ধতি গড়ে ওঠে। এ সময়ে টোল, পাঠশালা ও মক্তবে বাংলা, সংস্কৃত ও গণিত শিক্ষার বিস্তার ঘটে। এর পরে ১৭৫৭ সাল থেকে অর্থ্যাৎ ব্রিটিশ উপনিবেশকালে জেলায় ইংরেজী শিক্ষার সূত্রপাত ঘটে। ধর্ম উপযাজকরা ধর্ম প্রচারের পাশাপাশি বিভিন্ন মিশনারী স্কুল প্রতিষ্ঠা করতে শুরু করে যেখানে পাঠ্য হিসেবে ইংরেজী ভাষা শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত ছিল। মূলত বিংশ শতাব্দীর শুরুতে যশোর জেলায় মাধ্যমিক শিক্ষার প্রসার ঘটে। যশোর জেলার জনসাধারণের সাক্ষরতার হার উপকূলীয় জেলাগুলোর মধ্যে ৯ম স্থানে। সাত বছর বয়সের উপরের মোট জনসংখ্যার সাক্ষরতার হার প্রায় ৫১% (বি.বি.এস.,২০০১)। অন্যদিকে, প্রাপ্তবয়স্ক অর্থাৎ ১৫ বছর বয়সী ও উর্ধ্বের জনসাধারণের সাক্ষরতার হার ৫২%।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর (২০০৩) এর তথ্য অনুযায়ী যশোর জেলায় সর্বমোট ১,৬৩১ টি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। এর মধ্যে ৬৬২টি সরকারি। এই বিদ্যালয়গুলোতে মোট ৩,১৩,৮৪৭ জন ছাত্রছাত্রী লেখাপড়া করে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রী ভর্তির হার ৯৮%। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যার তুলনায় মোটামুটি পর্যাপ্ত। জেলায় প্রতি ১০০০০ জনগণের জন্য গড়ে ৭টি করে প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে, যা জাতীয় গড় সংখ্যার (৬) তুলনায় বেশি (প্রা: শি: অ:, ২০০৩)। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মোট শিক্ষক সংখ্যা ৬,৭২৩ জন। অর্থাৎ ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত ৪৭:১। এ ছাড়া বি.বি.এস., ১৯৯৮-এর তথ্য অনুযায়ী যশোর জেলায় মোট ২৫টি কিন্ডার গার্টেন রয়েছে।

সাক্ষরতার হার (৭^{+})	৫১%
প্রাপ্ত বয়স্কদের সাক্ষরতার হার (১৫^{+})	৫২%
জুনিয়র উচ্চ বিদ্যালয়	১৫২
মাধ্যমিক উচ্চ বিদ্যালয়	৩২৭
কিন্ডার গার্টেন	২৫
উচ্চ মাধ্যমিক কলেজ	৬৪
মাদ্রাসা	২৫৬
মোট প্রাথমিক বিদ্যালয়	১,৬৩১
সরকারি প্রাঃ বিদ্যালয়	৬৬২
ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা	৩,১৩,৮৪৭
ভর্তির হার	৯৮
গড় বিদ্যালয় (প্রতি ১০ হাজার)	৭

জেলায় মোট ১৫২টি জুনিয়র উচ্চ বিদ্যালয় রয়েছে, যার ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষক সংখ্যা যথাক্রমে ৩৫,৩০৪ ও ১,৬২৮ অর্থ্যাৎ ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত ২২:১। আবার জেলার মোট ৩২৭টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে মোট ছাত্রছাত্রী সংখ্যা ১,৪৫,৩০৪ জন। মোট শিক্ষক সংখ্যা ৫,৬১১ জন। অর্থ্যাৎ ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত ২৬:১। অন্যদিকে জেলার মোট মাদ্রাসার সংখ্যা ২৫৬টি। মোট ৪৯,২০৫ জন ছাত্রছাত্রীর জন্য ৪,৬১৬ জন শিক্ষক এখানে কর্মরত আছেন। ছাত্র-

শিক্ষক অনুপাত ১১:১, যা প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের তুলনায় ভাল। উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে মোট ৬৪টি মহাবিদ্যালয় রয়েছে যার মোট ছাত্রছাত্রী সংখ্যা ৩৮,২৯৪ জন এবং ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত ২০:১। জেলার অধিকাংশ ডিগ্রী কলেজে কলা, বিজ্ঞান ও বাণিজ্য শিক্ষাক্রম চালু রয়েছে। কারিগরি শিক্ষার জন্য স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এখানে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ও পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট রয়েছে।

উল্লেখ্য, যশোর জেলার প্রাচীন ও ঐতিহ্যমণ্ডিত ক'টি উল্লেখযোগ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হচ্ছে মাইকেল মধুসূদন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, সরকারি সিটি কলেজ, যশোর সরকারি মহিলা কলেজ, দাউদ পাবলিক স্কুল এবং পাঁজিয়া উচ্চ বিদ্যালয়।

অভিবাসন

জেলার জন্মস্থানভিত্তিক পরিসংখ্যান দেখায়, দেশের অন্যান্য জেলার লোকেরা মূলত মাঠে বা ক্ষেত খামারে কাজ করার জন্য যশোরের প্রতি আকৃষ্ট হতো। যশোরে অভিবাসিত জনগণের অধিকাংশই আসে খুলনা, ফরিদপুর, নোয়াখালী, কুষ্টিয়া, কুমিল্লা, ঢাকা, বরিশাল, পাবনা, ময়মনসিংহ, রাজশাহী, রংপুর, সিলেট এলাকা থেকে (গেজেটিয়ার, ১৯৭৯: ৫৫)। জীবন ও জীবিকার তাড়নায় এদের কেউ কেউ যশোরে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেছে। বি.বি.এস., ১৯৯১ অনুসারে জেলার মোট জনসংখ্যার (২১.৬ লাখ) প্রায় ১০.২৫% জনগণ যশোরের বাইরে থেকে আগত।

সামাজিক উন্নয়ন

সাক্ষরতার হার (৭^{+} বছর বয়সী), নিরাপদ পানি সুবিধা, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ও শয্যা প্রতি জনসংখ্যা ইত্যাদি বিষয় একটি জেলার সামগ্রিক সামাজিক উন্নয়নকে নির্দেশ করে। বিভিন্ন তথ্য সূত্র থেকে পাওয়া সংখ্যা ও গণনার ভিত্তিতে বলা যায়, যশোর জেলা সামগ্রিকভাবে সামাজিক উন্নয়নে মোটামুটিভাবে এগিয়ে আছে।

সাক্ষরতার হার (৭+ বছর)	৫১%
নিরাপদ পানির সুবিধাপ্রাপ্ত	৯৫%
স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা	৩৭%
শয্যাপ্রতি জনসংখ্যা	৫,৪৭৯

প্রধান জীবিকা দল

নদী ভরাট, নদী প্রবাহ পরিবর্তন, খাল-বিল ও বাঁওড়, জলাবদ্ধতা, উর্বর মাটি ও নিবিড় কৃষি পদ্ধতি জেলার মানুষের জীবন ও জীবিকায় প্রভাব ফেলে। চাষের জমির ক্রম বিভাজন একটি পরিবারকে কৃষি কাজের উপর আর নির্ভরশীল করে রাখতে পারছে না। তাই আজ কৃষক থেকে কৃষি শ্রমিকে পরিণত হচ্ছে মানুষ। নিরাপত্তাহীনতা, নদী-নালা ও বাঁওড় আর খালে মাছ কমে যাওয়া, মাছ ধরার উপকরণের উচ্চ মূল্য আর দাদন বা মহাজনী ব্যবসার কবলে পড়ে জেলেরা তাদের ঐতিহ্যবাহী পেশা থেকে সরে আসছে। উল্লেখ্য, জেলার প্রধান জীবিকা দলগুলো হল ক্ষুদ্র কৃষক, গ্রামীণ শ্রমিক (প্রধানত কৃষি শ্রমিক), শহুরে শ্রমিক ও জেলে। জেলার কৃষকরা চিংড়ি চাষী, মাছ চাষী বা পোনা চাষীতে পেশান্তরিত হচ্ছে।

কৃষক : জেলার মোট ক্ষুদ্র কৃষিজীবী (যাদের মোট কৃষি জমির পরিমাণ ০.০৫ - ২.৪৯ একর) পরিবারের সংখ্যা ২,২০,৯৯৮ টি, মধ্যম কৃষিজীবী (২.৫০ - ৭.৪৯ একর) পরিবারের সংখ্যা ৫১,১৮৯ টি এবং বড় কৃষক (৭.৫০+ একর) পরিবারের সংখ্যা মোট ৬,৪৯৭ টি (বি.বি.এস., ১৯৯৬)।

কৃষি শ্রমিক : কৃষি জমি ক্রমাগত কমে যাচ্ছে এবং পরিবারের বিভাজনে মাথা পিছু জমির পরিমাণও ব্যাপক হারে কমছে। ফলে কৃষি শ্রমিকের সংখ্যা বাড়ছে। জেলায় মোট কৃষি শ্রমিক গৃহস্থালির সংখ্যা ১,৫৯,৩৭০টি (বি.বি.এস., ১৯৯৬)। যশোর জেলার গ্রামাঞ্চলে এখনও কৃষি শ্রমিকদের চুক্তি অনুযায়ী অর্থ ও দৈনিক এক, দুই অথবা তিন বেলার আহার মজুরি হিসেবে প্রদান করা হয়।

জেলে : কথিত আছে যে, প্রাচীনকালে যশোর জেলা অসংখ্য নদ-নদী বিধৌত ছিল বলে জেলে সম্প্রদায়ের লোকেরা এখানে প্রথম বসতি গড়ে তোলে (বাংলাদেশ জেলা গেজেটিয়ার বৃহত্তর যশোর, ২৭)। যশোর জেলার মধুমতি ও ইছামতি নদীর তীরে জেলে সম্প্রদায়ের বসবাস। এদের অনেকেই বংশানুক্রমিকভাবে জেলে এবং প্রধানত হিন্দু ধর্মাবলম্বী। আবার মুসলমানদের অনেকেই মাছ ধরার পেশায় নিয়োজিত। মোট জেলে পরিবারের সংখ্যা ২৮,০০০, যা কৃষিজীবী পরিবারের ১০%। এখানে ১,০০০ টি বড় জেলে পরিবার, ৯,০০০ টি মাঝারি জেলে পরিবার এবং ১৮,০০০ টি ক্ষুদ্র জেলে পরিবার রয়েছে (বি.বি.এস., ১৯৯৬)। মহাজনী শোষণ ও মাছের আকালে জেলেরা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ছে।

শহুরে শ্রমিক : জেলায় শহুরে শ্রমিকের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে। কৃষি জমির অভাব, কাজের অভাব ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের (সিইজিআইএস, ২০০৪) কারণে গ্রামের ভূমিহীন ও অন্যান্য পেশার মানুষ শহরে এসে ভিড় জমায়। জীবিকার তাগিদে এদের কেউ কেউ যোগালী, নির্মাণ শ্রমিক, মুটে, মজুর, তাঁত শ্রমিক, পরিবহন শ্রমিক হিসেবে কাজ করে। অর্থাৎ যশোর জেলায় সামগ্রিকভাবে দিনমজুরির উপর নির্ভরশীলতা ক্রমশ বাড়ছে।

চিংড়ি চাষী : জেলায় কৃষকরা চিংড়ি চাষে উৎসাহী হয়ে উঠছে। তাই পেশান্তর ঘটছে। অর্থাৎ কৃষক হয়ে যাচ্ছে চিংড়ি চাষী। আশপাশের চিংড়ি চাষীদের সফলতা দেখে বর্তমানে বহু কৃষকই তাদের চাষের জমিকে চিংড়ি ঘেরে রূপান্তরিত করছে।

অর্থনৈতিক অবস্থা

জেলার মোট কর্মক্ষম জনশক্তি, মোট আয়, মাথাপিছু আয় এবং মাথাপিছু কৃষি জমির পরিমাণ - এ সবই সামগ্রিক অর্থনৈতিক অবস্থা বিশ্লেষণের প্রধান নির্দেশক। ১৯৯৯-২০০০ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী কর্মক্ষম মানুষের সংখ্যা ১,১৫৫ হাজার, যার মধ্যে ৫৯% পুরুষ। উল্লেখ্য, ১৯৯৫-৯৬ সালে কর্মক্ষম জনশক্তি ছিল ১,১৯৬ হাজার (যার মধ্যে ৬২% পুরুষ) অর্থাৎ যশোরে কর্মক্ষম পুরুষদের সংখ্যা ক্রমশ কমছে (বি.বি.এস., ২০০১)। চলতি বাজার দর অনুযায়ী জেলার বার্ষিক মাথাপিছু গড় আয় ১৮,৫৮৮ টাকা। যশোরে মাথাপিছু জমির পরিমাণ ০.০৮ হেক্টর এবং প্রায় ৪১% কৃষি শ্রমিক পরিবার (বি.বি.এস., ১৯৯৬)।

মাথাপিছু আয় (টাকা)	১৮,৫৮৮
বি.বি.এস ক্রম (মাথাপিছু আয় অনুসারে)	৯
মোট শিল্পে আয়	২৪
স্থির দরে বার্ষিক মোট আয় বৃদ্ধি	৫.২
বিদ্যুৎ সংযোজন সম্পন্ন গৃহ	৩৯

দারিদ্র্য

যশোর জেলার মোট জনসংখ্যার ৪৬% দরিদ্র এবং ১৭% অতি দরিদ্র (বি.বি.এস.- ইউনিসেফ, ২০০১)। এ ছাড়া জেলার মোট ৪৮% লোক ভূমিহীন এবং ৫৭% ক্ষুদ্র কৃষক (বি.বি.এস.,১৯৯৬)।

দরিদ্র	৪৬%
অতিদরিদ্র	১৭%
ভূমিহীন	৪৮%
ক্ষুদ্র কৃষক	৫৭%

নারীদের অবস্থান

অতি সম্প্রতি, সিপিডি - ইউএনএফপিএ বাংলাদেশের ৬৪টি জেলার মোট জনসংখ্যা, সাক্ষরতার হার এবং কর্মক্ষম জনসংখ্যার বিচারে নারী-পুরুষের অসমতার একটি ধারাক্রম নির্ধারণ করে একটি লিঙ্গ সম্পর্কিত উন্নয়ন সূচক তৈরী করেছে। এতে দেখা যায় যশোর জেলা "নিম্ন মাত্রার লিঙ্গীয় অসমতার" এলাকা। এখানে নারীরা পর্দা প্রথার মধ্যে বসবাস করে না। যশোরের নারীরা অনেক বেশি কর্মঠ। তাই, গ্রামাঞ্চলে নারীদের ক্ষেত খামারে কাজ করতে দেখা যায়। নারীরা ধান রোপন থেকে শুরু করে ফসল বোনা পর্যন্ত প্রতিটি ধাপে নিবিড় শ্রম দেয়। পাট জাগ দেয়া ও ঘের তৈরিতে নারীরা পুরুষদের মতই শ্রম দেয়।

লিঙ্গ অনুপাত : মোট জনসংখ্যার ৪৮% নারী। জেলার লিঙ্গ অনুপাত ১০৮:১০০। অপ্রাপ্ত বয়স্ক (০-১৪ বছর) লিঙ্গ অনুপাত ১১১:১০০। আবার প্রজননক্ষম বয়স দলে (১৫-৪৯ বছর) **লিঙ্গ অনুপাত** ১০০:১০৪। অর্থাৎ প্রজনন বয়স দলে পুরুষের সংখ্যা নারীদের চেয়ে বেশি।

বৈবাহিক অবস্থান : জেলার ১০ বছর ও তার উর্ধ্বে মোট জনসংখ্যা হল ১৯.০০ লাখ। এর মধ্যে ৩২% নারী বিবাহিত এবং ০.৫৬% নারী স্বামী পরিত্যক্তা (বি.বি.এস., ২০০১)। এখানে বিয়ে নিবন্ধনের হার ৮৬% (বি.বি.এস.-ইউনিসেফ, ২০০১)।

প্রজনন স্বাস্থ্য : জেলার নারীদের মোট প্রজনন হার ২.৭ (বি.বি.এস.-ইউনিসেফ, ২০০১)। অর্থাৎ একজন নারী তার জীবদ্দশায় গড়ে ৩টি সন্তান জন্ম দেয়। জেলার নবজাতক মৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ৫৫ জন। পরিবার পরিকল্পনা তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (স্বাস্থসেবা অধিদপ্তর, ২০০০)-এর তথ্য অনুসারে, জেলায় মাতৃমৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ৫জন, যা নানা প্রপঞ্চ দ্বারা প্রভাবিত। খাদ্যের অসম বন্টন, ঝুঁকিপূর্ণ সন্তান জন্মদান, আধুনিক স্বাস্থ্য সেবার অভাব যেমন, ডাক্তার, ক্লিনিক ও হাসপাতালের অভাব মায়েদের মৃত্যু হারকে প্রভাবিত করে। জেলার ১৩-৪৯ বয়স দলের মোট ৫৬% নারী আধুনিক পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণ করেছে, যা সমগ্র উপকূলীয় অঞ্চলে ৪১.২% (নিপোর্ট, ২০০৩)।

- **১৫-৪৯ বছরের লিঙ্গ অনুপাত (১০৪:১০০) জাতীয় অনুপাতের (১০০:১০০) তুলনায় বেশি ।**
- **৫ বছরের কম বয়সী শিশু মৃত্যুর হার প্রতি হাজারে (৮৪) জাতীয় হারের (৯০) তুলনায় কম।**
- **সাক্ষরতার হার ৪৬% জাতীয় হার (৪১%)-এর তুলনায় বেশি।**
- **মেয়েদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির হার (১০০) জাতীয় হারের (৯৮) বেশি।**
- **স্বামী পরিত্যক্তা নারীর সংখ্যা (০.৫৬) জাতীয় সংখ্যার (০.৩৭) তুলনায় বেশি।**
- **কৃষিজীবী নারী প্রধান গৃহের সংখ্যা (৪%) জাতীয় সংখ্যার (৩.৪%) তুলনায় বেশি।**
- **জেলায় ১৫-৪৯ বয়সদলের ৩৩% নারী খাদ্য বা অর্থের বিনিময়ে কর্মরত, যা জাতীয় (২৮%) ও উপকূলীয় অঞ্চলের (২৬%) তুলনায় বেশি।**
- **জেলায় ১৩-৪৯ বয়স দলের নারীদের মধ্যে আধুনিক জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহারের হার ৫৬%, যা জাতীয় (৪৪%) ও উপকূলীয় অঞ্চলের (৪১%) হারের তুলনায় বেশি ।**

শ্রম বিভাজন : গ্রামাঞ্চলে নারী-পুরুষের কাজের ক্ষেত্রে ভিন্নতা নেই। কেননা নারীরা ঘরের বাইরে প্রধানত পারিবারিক উৎপাদন প্রক্রিয়া, দিনমজুরি ও পরের গৃহে পুরুষদের মতই শ্রম দিতে সমর্থ। মূলত প্রাকৃতিক দুর্যোগ, কর্মক্ষম পুরুষ সদস্যের অভাব ও দারিদ্র্যের কষাঘাতে দরিদ্রতম নারীরা বেঁচে থাকার তাগিদে শহরাঞ্চলে কাজ নেয়।

সমাজে নারীর গতি-প্রকৃতি কিছু প্রপঞ্চের উপর নির্ভরশীল। অপ্রতুল যোগাযোগ ব্যবস্থা, ধর্মীয় অনুশাসন, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি এই জেলার নারীদের গতিশীলতার ক্ষেত্রে প্রধান বাধা। তবে নারীদের চলাচলের প্রকৃতি অনেকাংশেই সম্পদের সূচকের উপর নির্ভরশীল (কেয়ার, ২০০৩)। রাস্তা-ঘাটের ক্রমউন্নয়ন, ক্ষুদ্র ঋণ সুবিধা, এনজিওদের সচেতনতামূলক কার্যক্রম ও প্রকল্প কার্যক্রম নারীদের বাইরের জগতের সাথে সম্পৃক্ত করতে সহায়তা করছে।

শ্রমশক্তি : যশোরের নারীদের মধ্যে কর্মক্ষম শ্রম শক্তির হার ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯৯৫-৯৬ সালে কর্মক্ষম শক্তির অর্থাৎ ১৫ বছরের ঊর্ধ্বে জনগণের ৩৮% ছিল নারী। পরবর্তীতে ১৯৯৯-২০০০ সালে তা বেড়ে হয় ৪১% (বি.বি.এস.,২০০১)। এর মধ্যে ৪৩% গ্রামীণ নারী ও ৪১% শহুরে নারী। অর্থাৎ গ্রাম ও শহরে নারীদের প্রায় সমান অংশগ্রহণ রয়েছে। প্রাকৃতিক দুর্বিপাকে পড়েই হোক আর দারিদ্র্যের কারণেই হোক, গ্রামীণ নারীরা সেই চিরায়ত অধ:স্তনতা ও পারিবারিক উৎপাদন পদ্ধতি থেকে বেরিয়ে আসতে শুরু করেছে। আর তাই গ্রামীণ কৃষিজীবী পরিবারের ২% নারীদের পরের জমিতে কাজ করতে দেখা যায় (বি.বি.এস., ১৯৯৬)। জেলার ১৫-৪৯ বছর বয়সী নারীদের মধ্যে মাত্র ৩৩% অর্থ বা খাদ্যের বিনিময়ে বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত, যা সমগ্র উপকূলীয় অঞ্চলে ২৬% (নিপোর্ট, ২০০৩)।

স্বাস্থ্য পুষ্টি : অতি অপুষ্টি, অপর্যাপ্ত স্বাস্থ্য কাঠামো ও সেবা ব্যবস্থা জেলার নারীর স্বাস্থ্য দশাকে আক্রান্ত করছে। জেলার মেয়ে শিশুদের মধ্যে অতি অপুষ্টির হার ৯%, যা জাতীয় হারের (৮%) তুলনায় বেশি। পর্যাপ্ত নিরাপদ পানি ও পয়ঃসুবিধার অভাব তাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। প্রজনন স্বাস্থ্যসেবার অভাবে ৯৬% নারীই ঘরে সন্তান জন্ম দিয়ে থাকেন। ৬৯% ক্ষেত্রে আত্মীয় পরিজন, প্রতিবেশীরা সন্তান জন্ম নেয়ার সময় সহায়তা করেন। মাত্র ২৪% নারী প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত দাইদের সেবা পান। তবে আধুনিক ডাক্তারদের সেবা প্রাপ্ত নারীর সংখ্যা মাত্র ৭% (বি.বি.এস.-ইউনিসেফ, ২০০১)।

শিক্ষা : যশোরের নারীদের সাক্ষরতার হার সন্তোষজনক নয়। ৭ বছর$^{+}$ বয়সী মেয়েদের মধ্যে সাক্ষরতার হার মাত্র ৪৬%, যা প্রাপ্তবয়স্ক নারীদের সাক্ষরতার হার (৪৫%)-এর তুলনায় সামান্য বেশি (বি.বি.এস., ২০০১)। প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে যশোরের মেয়েরা এগিয়ে নেই। কেননা মোট ছাত্রছাত্রীদের ৪৯% মেয়ে শিশু, যাদের বয়স ৬ থেকে ১০ বছরের মধ্যে। তবে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মেয়ে শিশু ভর্তির হার ১০০। অর্থাৎ মেয়ে শিশুরা স্কুলে ভর্তি হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু তাদের মধ্যে অনেকেই প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তির আগেই ঝড়ে (Drop out) যাচ্ছে। তবে স্কুল ও মাদ্রাসার চিত্র তুলনামূলকভাবে ভাল। স্কুলের মোট ছাত্রছাত্রীর ৫৩% ছাত্রী এবং মাদ্রাসায় মোট ছাত্রছাত্রীর ৬৩% ছাত্রী (ব্যানবেইস, ২০০৩)। তবে কলেজগুলোতে ছাত্রীসংখ্যা ছাত্রদের তুলনায় কম। মাত্র ৩৭% ছাত্রী জেলার কলেজগুলোতে লেখাপড়া করে।

নারী নির্যাতন : ঘরের ভেতরে-বাইরে নারীরা প্রতিনিয়তই নানা ধরনের নির্যাতনের শিকার। ঘরে নারী নির্যাতন জেলার একটি অতি পরিচিত ঘটনা। এ ছাড়া যৌতুক, বাল্য বিয়ে, বহু বিয়ে, নির্যাতন, হত্যা, ধর্ষণ, জোরপূর্বক বিয়ে, মজুরি শোষণ এবং সীমান্ত পথে নারী ও শিশু পাচার জেলার নারী নির্যাতনের অন্যতম কয়টি উদাহরণ। যশোরে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নারীদের বঞ্চনার চিত্র আরো করুণ। সমাজপতিদের হাতে এরা প্রায়ই নানারকম দৈহিক ও মানসিক প্রবঞ্চনার শিকার হয়।

অবকাঠামো

রাস্তা-ঘাট

পাকা রাস্তা	৩,১২৩ কি. মি.
সওজ রাস্তা	২৯০ কি. মি.
এলজিইডি রাস্তা	২৮৩৩ কি. মি.
রাস্তার ঘনত্ব	১.২২ কি.মি./ বর্গ কি.মি.

বি.বি.এস., ২০০৩-এর তথ্য অনুযায়ী যশোর জেলায় মোট ৩,১২৩ কি.মি. পাকা রাস্তা রয়েছে। সড়ক ও জনপথ বিভাগের মোট ২৯০ কি.মি. রাস্তার মধ্যে ১১৯ কি.মি. ফিডার রোড-এ, ৬১ কি.মি. আঞ্চলিক মহাসড়ক ও ১১০ কি.মি. জাতীয় মহাসড়ক। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের (এলজিইডি) ১২৫ কি.মি. ফিডার রোড-বি, ১,১১৯ কি.মি. গ্রামীণ রাস্তা, ১,৫৮৯ কি.মি. গ্রামীণ রাস্তা ধরন-২ রয়েছে। জেলায় রাস্তার ঘনত্ব ১.২২ কি.মি./ বর্গ কি.মি. যা উপকূল অঞ্চল ও জাতীয় অবস্থার তুলনায় অনেক ভাল। শুধু তাই নয়, রাস্তার ঘনত্বের বিচারে যশোর জেলা সমগ্র উপকূল অঞ্চলের সবচেয়ে উন্নত।

যশোর জেলায় রাস্তাঘাট বা যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের সুদীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। ১৫শ শতাব্দীতে ভৈরবের তীরে যশোর জেলার প্রথম সড়কটি নির্মিত হয়। খান জাহান আলী এটি নির্মাণ করেন তার অনুসারীদের নিয়ে সুন্দরবনের দক্ষিণে যাবার পথে। ১৮০২ সালে L.S.O Malley লেখেন "জেলায় ২০ মাইল রাস্তা রয়েছে এবং কোন নদীতেই সেতু নেই"।

মূলত ১৮শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে জনৈক কালী প্রসাদ রায় ওরফে কালী পোদ্দার-এর উদ্যোগে জেলায় কয়টি সেতু নির্মিত হয়। তিনি রাস্তা ও সেতু নির্মাণে সম্পত্তি ও অর্থ অনুদান প্রদান করেন। এর পরে যশোরের রাস্তাঘাটের উন্নয়ন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। তারই প্রতিফলন আমরা দেখতে পাই W.W Hunter-এর একটি হিসেব পত্রে। তিনি দেখান ১৮৭৫ সাল পর্যন্ত জেলায় মোট ২৬৪ মাইল দীর্ঘ আঞ্চলিক রাস্তা তৈরি হয়। তবে যশোর পৌরসভার রাস্তা উপবিভাগীয় শহরের রাস্তার মোট পরিমাণ এই হিসেবের বাইরে ছিল। এতে ১৯২৪ সালে জেলার ঢালাই ও ঢালাই বিহীন রাস্তার মোট মাইলেজ দাঁড়ায় ১৫৪৫-তে, অর্থাৎ সেই সময়েই জেলার রাস্তার ঘনত্ব ছিল অনেক বেশি। স্বাধীনতাত্তোর কালে জেলার রাস্তাঘাটের ব্যাপক উন্নয়ন ঘটে। সড়ক পথে সারাদেশ ও পার্শ্ববর্তী ভারতের সাথে যোগাযোগ স্থাপিত হয়।

এর পরও গ্রামাঞ্চলে রাস্তাঘাটের দশা ভাল নয়। অতি বর্ষণ বা স্বাভাবিক মৌসুমী বৃষ্টিতেই গ্রামের রাস্তাগুলো চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়ে। ফলে জনসাধারণের স্বাভাবিক চলাচল, স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণ, ছেলেমেয়েদের স্কুলে যাওয়া, কৃষিসহ অন্যান্য পণ্য সরবরাহ এবং বাজারজাত করতে দুর্ভোগ পোহাতে হয়। রাস্তা-ঘাটের উন্নয়ন ঘটলে প্রত্যন্ত এলাকার মানুষ যোগাযোগ সুবিধার মাধ্যমে তাদের জীবনমান উন্নত করার সুবিধা পাবে। এ ছাড়া শহরাঞ্চলে বর্ষা মৌসুমে রাস্তা খোঁড়াখুঁড়ি ও সংস্কার কাজের অভাবে কোন কোন রাস্তা চলাচলের ক্ষেত্রে অসুবিধার সৃষ্টি হয়।

নৌ-পথ

বৃহত্তর যশোর জেলার নদী-নালার অর্থনৈতিক গুরুত্ব অপরিসীম। এখানে মোট ৮৯ নটিক্যাল মাইল নৌপথ আছে এবং এখানকার নৌ পরিবহনের সুপ্রাচীন ইতিহাস রয়েছে। বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত যশোরের নদীপথে

স্টিমার সার্ভিস চালু ছিল। সময়ের ধারায় নদীগুলোর গভীরতা হ্রাস পাওয়ায় স্টিমার সার্ভিসও ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে যায়।

মূলত নদীপথগুলোর নাব্যতার উপর সমস্ত নৌপরিবহন ব্যবস্থা নির্ভরশীল ছিল। বর্তমানে পশ্চিমের নদীগুলো অগভীর হয়ে পড়ায় কেবলমাত্র বর্ষাকালেই ছোট ছোট নৌকায় যাতায়াত সম্ভব। কপোতাক্ষ নদী বাঘা থেকে ঝিকরগাছা পর্যন্ত অংশে বর্ষায় নাব্য থাকে। তাই ঝিকরগাছা থেকে উত্তরে চৌগাছা পর্যন্ত ছোট ছোট নৌকা চলাচল করলেও শীতকালে চৌগাছার পরে আর নৌকা চলে না। কেশবপুরের পশ্চিমে ভদ্রা শুকিয়ে গেলেও আলতোপোল থেকে ভাটি এলাকায় সুন্দরবনের ভিতর আকাঁ বাঁকা পথে দেশী বা যন্ত্রচালিত নৌকা সারা বছর ধরে চলাচল করে। এতে হাটবারে খুলনা থেকে ধান বোঝাই নৌকা কেশবপুরে আসে এই নৌপথে। তবে পূর্বের নদীগুলো সারা বছর নাব্য থাকে। মধুমতি নদী নৌপরিবহনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। জেলার পূর্ব সীমানা দিয়ে প্রবাহিত মধুমতি নদী মোটামুটিভাবে বছরব্যাপী নাব্য থাকার কারণে সুন্দরবনে যাতায়াতের ক্ষেত্রে প্রধান নদী পথ। ভৈরব নদীর দক্ষিণে আফ্রাঘাট পর্যন্ত ৬ ফুট গভীর খোল সম্পন্ন নৌকা চলাচলে সক্ষম। নবগঙ্গা ও মধুমতি নদীর মধ্যে সংযোগ খাল খনন করায় নবগঙ্গা নদীতে পূর্বাঞ্চলের সাথে নৌপরিবহন ও ব্যবসা-বাণিজ্য বেড়েছে।

উপজেলা ভিত্তিক নৌপথের বিবরণ

উপজেলা	নৌপথ (নোটিক্যাল মাইল)
অভয়নগর	১৫
বাঘেরপাড়া,	২৫
চৌগাছা,	৭
ঝিকরগাছা	২৮
কেশবপুর	৯
যশোর সদর	৫
মোট	৮৯

রেল-পথ

বৃহত্তর যশোর জেলায় রেলপথের দৈর্ঘ্য ১০৫.০৫ কি.মি. । জেলার সর্বপ্রথম রেল সংযোগ স্থাপিত হয় ১৮৮৪ সালে, অর্থাৎ ব্রিটিশ আমলে একটি ব্যক্তিখাতভিত্তিক সংস্থা "The Bengal Central Railway" কলকাতা-যশোর রেল লাইন স্থাপন করে। শুরুতে এই রেলপথ কলকাতা থেকে যশোর হয়ে তালতলাহাট পর্যন্ত ছিল। এই রুটে কয়টি উল্লেখযোগ্য রেলওয়ে স্টেশন হল ঝিকরগাছা, ঘাট, গোদখালি, নাভারন এবং বেনাপোল ইত্যাদি সবগুলো ব্রডগেজ রেল লাইন। বর্তমানের কয়টি উল্লেখযোগ্য রেলওয়ে স্টেশন হল নওয়াপাড়া, চেংগুটিয়া, সিংগিয়া, রূপদিয়া, যশোর, মেহিরুল্লানগর, বড় বাজার, মুবারকগঞ্জ, সুন্দরপুর এবং কোটচাঁদপুর ইত্যাদি। জেলার চারটি উপজেলার মধ্য দিয়ে চলে যাওয়া রেলপথের দৈর্ঘ্য সারণীতে দেখান হল।

উপজেলা	রেলপথ (কি.মি.)
অভয়নগর	১৩
ঝিকরগাছা	১৫.৫
সদর	৩৫
শার্শা	৩৫
মোট	৯৮.৫

বিমানবন্দর

জেলা সদরে যশোর সেনানিবাসের পাশে বিমানবন্দরটি অবস্থিত। আকাশপথে যশোর-ঢাকা রুটের গুরুত্ব অপরিসীম। কেননা খুলনা ও আশপাশের জেলার যাত্রীদের বিমানে ভ্রমণের সুবিধা দিয়েছে এই যশোর বিমানবন্দর। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে যশোরে "যশোর বেঙ্গল এয়ারযোন"-এর সদর দফতর স্থাপিত হয়। ফলে সেসময় থেকেই শহরের যোগাযোগ ব্যবস্থা গুরুত্ব পেতে শুরু করে। এই ধারাবাহিকতায় একসময় যশোর বিমানবন্দর স্থাপিত হয়।

পোল্ডার

জলোচ্ছ্বাসের বিপর্যয় থেকে রক্ষার তাগিদে ষাটের দশকে যশোর জেলায় পোল্ডার নির্মাণের কাজ শুরু হয়। পোল্ডার ২৪-এর সাহায্যে ২৮,৩৪০ হে. জমি সংরক্ষণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, খুলনা জেলার

বাঁধ	২৬ কি.মি.
রেগুলেটর	১১টি

ডুমুরিয়া উপজেলার কিছু অংশ এই পোল্ডার এলাকার আওতাধীন। এই পোল্ডার এলাকায় রয়েছে ২৬ কি.মি. দীর্ঘ ভেড়ী বাঁধ ও ১১টি রেগুলেটর (সিইআরপি, ২০০০)। এই সমস্ত কাঠামোর মাধ্যমে জেলার পানি ব্যবস্থাপনার কাজটি চলে।

হাট-বাজার ও বন্দর

রাস্তা-ঘাটের উন্নয়ন, মানুষের চাহিদা, ভোগ্য পণ্যের বিস্তারের কারণে জেলায় হাট বাজারের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। জেলায় মোট ২৬১ টি হাট-বাজার রয়েছে । উল্লেখ্য, ব্যবসাকেন্দ্র হিসেবে যশোরের গুরুত্ব কেবল বাড়ছে। যশোর শহরের ৩৪ কি.মি. দক্ষিণে মরিচের বৃহৎ ব্যবসা কেন্দ্র রয়েছে। কেশবপুর উপজেলা যশোর জেলার একট প্রসিদ্ধ স্থান এবং বাণিজ্য কেন্দ্র। যশোর শহর থেকে ২০ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত কেশবপুর চিনি, গুড়, মরিচ ও কাপড়ের ব্যবসার জন্য বিখ্যাত।

হাটবাজারের খতিয়ান

উপজেলা	হাট বাজারের সংখ্যা
অভয়নগর	২২
বাঘেরপাড়া,	১৩
চৌগাছা,	৩৩
ঝিকরগাছা	৩৬
কেশবপুর	২৩
যশোর সদর	৫৫
মনিরামপুর	৬০
শার্শা	১৯
মোট	২৬১

বেনাপোল স্থলবন্দর : সীমান্তবর্তী জেলা যশোর সরাসরি প্রতিবেশী দেশ ভারতের সাথে যুক্ত। বেনাপোল স্থলবন্দর অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

বিদ্যুৎ ও টেলিযোগাযোগ

যশোর জেলায় বিদ্যুৎ সংযোগসম্পন্ন ঘরের সংখ্যা ২,০৩,৯৪০, যা মোট ঘরের ৩৯%। তবে শহর ও গ্রামে বৈদ্যুতিক সংযোগের ক্ষেত্রে ব্যাপক পার্থক্য রয়েছে। শহরের মোট ৬৯% ঘরে বিদ্যুৎ সংযোগ রয়েছে। অথচ গ্রামের পরিমাণ মাত্র ৩৩%। উল্লেখ্য, ১৯৯১ সালে জেলার মাত্র ১৫% ঘরে বিদ্যুৎ সংযোগ ছিল।

শহরে বিদ্যুৎ সংযোগ	**৬৯%**
গ্রামীণ বিদ্যুৎ সংযোগ	**৩৩%**
পল্লী বিদ্যুৎ সংযোগ	**৩,৮০৩ বর্গ কি.মি.**

পল্লী বিদ্যুতের ক্ষেত্রে যশোর স্টেশন ১ ও ২ থেকে সমগ্র জেলায় বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়। পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের আওতায় জেলার ৮টি উপজেলার মোট ৩,৮০৩ বর্গ কি.মি. এলাকায় বিদ্যুৎ সংযোগ দেয়া হয়েছে। জেলার টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা বেশ উন্নত। বিংশ শতাব্দীর ষাটের দশকে জেলার ডাক ও টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নতি হতে থাকে। বর্তমানে জেলায় মোট টেলিফোন সংযোগের সংখ্যা ৩,৮৯৯টি। যশোরের ঝিকরগাছা ও সদর উপজেলায় টেলিফোন এক্সচেঞ্জ রয়েছে।

শিল্প ও বাণিজ্য অবকাঠামো

যশোর জেলা ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প নির্ভর জেলা হিসেবে পরিচিত। ১৯৬০ সালের পরবর্তী সময়ে এখানে বড় বড় কিছু শিল্প কারখানা গড়ে ওঠে। এর মধ্যে টেক্সটাইল মিল, তাঁত, ধান কল, চিরুনী কারখানা, ময়দা কল, কাঠের কল, বরফ কল, অ্যালুমিনিয়াম ফ্যাক্টরি, বিড়ি ফ্যাক্টরি, মোমবাতির ফ্যাক্টরি, প্রিন্টিং প্রেস, তেল কল, বেকারী, ছাপাখানা ও বাঁধাই কারখানা, ব্যাটারী ফ্যাক্টরি অন্যতম। জেলায় কয়টি উল্লেখযোগ্য পাটকল রয়েছে। এরমধ্যে পূর্বাচল পাটকল, নওয়াপাড়া পাটকল, কার্পেটিং পাটকল এবং যশোর পাটকলের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের মধ্যে বাঁশ, বেত, কাঠের কাজ, যন্ত্রাংশ ঝালাই কারখানা, রিক্সা-রেডিও-টিভি মেরামত কারখানা, জাল তৈরী, কামার ইত্যাদির কথা বলা যায়। জেলার সর্বত্র হস্তচালিত তাঁতের বিস্তার লক্ষণীয়। জেলায় ৮০৪টি মাছের খামার, ১৩২টি পশুসম্পদ খামার, ১,০৬৪টি হাঁস মুরগীর খামার ও ৩৯টি হ্যাচারী রয়েছে। এ ছাড়া

অভয়নগরের তালতলা হাটের চামড়া ট্যানিং কারখানা "এস.এ.এফ ইন্ডাস্ট্রিজ", আটটি ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপ, ভোজ্যতেল ও সাবান তৈরির কারখানা, বোতাম, অলংকার ও চুন তৈরির কারখানা উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশের অন্যতম গুড় উৎপাদনকারী জেলা যশোর এবং এটি একটি উল্লেখযোগ্য কুটির শিল্প। আঠার শতকের শেষার্ধে এই জেলা খেজুর গুড়ের জন্য বিখ্যাত ছিল। কেননা সে সময়ে যশোরের উৎপাদিত গুড় কলকাতায় চালান দেয়া হতো। সেইসাথে আখের গুড়ও পর্যাপ্ত পরিমাণে উৎপাদিত হতো। উল্লেখ্য, খেজুর গুড়ের লাভজনক ব্যবসায় আকৃষ্ট হয়েই কয়েকজন ইংরেজ ব্যবসায়ী জেলার কেশবপুর, চৌগাছায় খেজুর গুড়ের কারখানা গড়ে তোলেন। বর্তমানে এখানে মোট ৭,১৯৩টি গুড় তৈরির কারখানা রয়েছে। যশোরের উল্লেখযোগ্য ও ঐতিহ্যবাহী শিল্পের মধ্যে অন্যতম তাঁতশিল্প। বর্তমানে জেলার কয়েক লক্ষ মানুষ তাঁত শিল্পের উপর নির্ভরশীল। জেলার কোন কোন জায়গায় তাঁতশিল্প পরিবারভিত্তিক মালিকানায় পরিচালিত হলেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যৌথ ও সমবায়ভিত্তিক উদ্যোগে তা পরিচালিত হচ্ছে। শাড়ি, মশারি, তোয়ালে, গামছা, লুঙ্গি তৈরি হয় এ সমস্ত তাঁতে। ১৯৬১ সালে যশোরের নওয়াপাড়ায় গড়ে ওঠা "বেঙ্গল টেক্সটাইল মিলস লিমিটেড" জেলার বৃহদায়তন শিল্পগুলোর মধ্যে অন্যতম। ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ সরকার এটিকে জাতীয়করণ করেন এবং তারপর থেকেই এটি "বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস কর্পোরেশন"-এর উদ্যোগে পরিচালিত হচ্ছে।

বিলুপ্তপ্রায় শিল্প : যশোর জেলা একসময় উপমহাদেশে চিরুনী শিল্পের জন্য বিখ্যাত ছিল এবং ১৯০১ থেকে ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত চিরুনী ব্যবসায় যশোর ছিল অপ্রতিদ্বন্দ্বী। ১৯০১ সালে "কম্বস এ্যান্ড সেলুলয়েড ওয়ার্কস" নামের কারখানাটি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে যশোরে চিরুনী শিল্পের সূত্রপাত ঘটে। তখন ভারত থেকে আমদানি করা মহিষের শিং থেকে অতি উন্নতমানের চিরুনি তৈরি হত। পাক-ভারত বিভক্তির পরে মহিষের শিং রপ্তানি বন্ধ হয়ে যাওয়া, ভারতীয় স্বল্প মূল্যের চিরুনীর বাজারদখল, সেলুলয়েডের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি ও উৎপাদনের উপর অপরিমিত কর আরোপ চিরুনী শিল্পকে ম্লান করে দেয়। এখনও জেলায় কয়টি চিরুনী কারখানা রয়েছে, তবে আগের মতো বড় কলেবরে নয়।

একই সময়ে তারা বেশ কয়টি চিনির কল স্থাপন করে। কিন্তু ব্যবসায় ব্যর্থ হয়ে সেই কারখানাগুলোতে চিনির পরিবর্তে দেশীয় মদ তৈরি শুরু হয়। উল্লেখ্য, চিনিশিল্পে ইংরেজরা মার খেলেও ইংরেজরাই প্রথম এই জেলার মানুষকে চিনি শিল্পে আকৃষ্ট করে। এ প্রসঙ্গে জেলা গেজেটিয়ার-এ উল্লেখ করা হয়েছে "ব্রিটিশদের ছাড়া চিনি শিল্প গড়ে ওঠার পরই স্থানীয় ব্যবসায়ীরা এই শিল্পে এগিয়ে আসে। "ময়রা" বা মিষ্টি প্রস্তুতকারীরা এতে অগ্রণী ভূমিকা নেয়। ফলে একসময় তারা চিনি ব্যবসাকে তাদের এক চেটিয়া ব্যবসায় পরিণত করে। ১৮৮০ সাল পর্যন্ত এই ধারা অব্যাহত ছিল"। তবে আমদানী করা চিনি দামে সস্তা হবার কারণে দেশীয় চিনির কারখানাগুলো বন্ধ হয়ে যেতে থাকে। আর তাই ১৯০১ সালের ১১৭টি কারখানা মাত্র ২৩ বছরের ব্যবধানে ১৯২৪-এ ৫০টিতে নেমে আসে। বর্তমানে চিনির কারখানা নেই বললেই চলে।

যশোর জেলা একসময় ইংরেজরা নীল চাষের প্রসার ঘটায়। সদর উপজেলা নীল চাষের উল্লেখযোগ্য কেন্দ্র ছিল। রূপদিয়ায় প্রথম নীল কারখানা স্থাপিত হয়। ১৮৬৮-৬৯ সালের জরীপে জানা যায় সেই সময়ে জেলার দুই লাখ বিঘা জমিতে নীল চাষ করা হতো এবং ১৮৯৫-৯৬ সালে জেলায় ১৭টি নীল কুঠি ছিল (যশোহর খুলনার ইতিহাস, ৩১)। কিন্তু নীলকরদের অত্যাচার ও প্রতাপের কারণে একসময় নীলচাষীদের সাথে দাঙ্গা হাঙ্গামা শুরু হয় এবং কালক্রমে নীল চাষ বন্ধ হয়ে যায়।

সেচ ও গুদাম সুবিধা

জেলার কৃষিজীবী লোকেরা আধুনিক ও ঐতিহ্যবাহী - দুই ধরনের প্রযুক্তি ব্যবহার করেন। এখানে আধুনিক সেচ প্রযুক্তি বলতে প্রধানত নলকূপ, গভীর ও অগভীর নলকূপ, এল.এল.পি পাম্প ইত্যাদিকে বুঝায়। জেলায় মোট সক্রিয় অগভীর নলকূপের সংখ্যা ২২,৯০৪টি,

মোট সেচ এলাকা	১,৫৩,৮৭২ হে.
সেচ এলাকা (%)	৮০%
ভূ-গর্ভস্থ পানি ব্যবহার	৭৮%
উপরিভাগের পানি ব্যবহার	২%

এল.এল.পি ৪২টি, গভীর নলকূপ ১,৩২৪টি, নলকূপ ৫,১০৩টি, পাম্প ৭৯৫টি এবং ৩১২টি ঐতিহ্যবাহী প্রযুক্তির আওতায় মোট ১,৫৩,৮৭২হে. জমিতে সেচ দেয়া হয় (বি.বি.এস., ১৯৯৮)।

গুদামের ধরন	সংখ্যা	ধারণ ক্ষমতা (মে.টন)
খাদ্য	২৮	২১,০১৫
বীজ	৭	৬,১০০
সার	৩	৪,৫৫০

যশোর জেলায় উৎপাদিত কৃষিপণ্য গুদামজাতকরণের সুবিধা রয়েছে। বি.বি.এস., ১৯৯৮- এর অনুসারে এই জেলায় মোট ২৮টি খাদ্য গুদাম রয়েছে। যাদের প্রতিটির খাদ্যদ্রব্য ধারণ করার ক্ষমতা হল ২১,০১৫ মে. টন। এ ছাড়া এখানে বীজ সংরক্ষণের জন্য ৬,১০০ মে. টন ধারণ ক্ষমতার ৭টি গুদাম আছে। উল্লেখ্য, জেলায় সার সংরক্ষণের জন্য ৩টি সার গুদাম রয়েছে। যাদের প্রতিটির ধারণ করার ক্ষমতা ৪,৫৫০ মে. টন।

সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান

যশোর জেলায় বিভিন্ন ধরনের সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান দেখা যায়। এর মধ্যে ১৯৮টি ক্লাব, ১৬টি নারী সংগঠন, ১১টি গণ গ্রন্থগার, ২৪টি থিয়েটার দল, ৫টি থিয়েটার দল, ১৯টি সিনেমা হল, ১৩৪ টি ডাকঘর ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ২,৯৩৬টি মসজিদ, ১৯টি খৃষ্টীয় উপসানালয়, ৩৩৭টি মন্দির, ৪টি দরগাহ্ ও ৮টি মাজারের কথা উল্লেখযোগ্য।

উন্নয়ন প্রকল্প

বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা ২০০৩-২০০৪ অনুসারে যশোর মোট ১০টি সরকারী সংস্থার মোট ১৭টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। উল্লেখ্য, এখানে যে সব প্রকল্প কেবল ২০০৪ সালের জুন মাসের পরে চালু আছে ও থাকবে তাদের হিসেব তুলে ধরা হয়েছে। যে সমস্ত সরকারি সংস্থার মাধ্যমে এই প্রকল্পগুলো বাস্তবায়িত হচ্ছে তা হল বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, মৎস্য বিভাগ, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, সড়ক ও জনপথ বিভাগ, পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড ইত্যাদি। এই প্রকল্পগুলো প্রধানত বাংলাদেশ সরকার, ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট এসোসিয়েশন (IDA), বিশ্ব খাদ্য সংস্থা (WFP), নেদারল্যান্ডস সরকার (GoN), যুক্তরাজ্য সরকার (DfID), ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (IDA), কানাডিয়ান ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি (CIDA), ইউনাইটেড নেশনস ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (UNDP), গ্লোবাল এনভায়রনমেন্টাল ফ্যাসিলিটি (GEF), এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (ADB), ইউনিসেফ (UNICEF) ও কুয়েত সরকারের অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন।

সরকারি সংস্থা	প্রকল্প সংখ্যা
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড	২
পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা	১
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর	১
মৎস্য বিভাগ	২
জনস্বাস্থ্য ও প্রকৌশল অধিদপ্তর	৪
বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড	১
সড়ক ও জনপথ বিভাগ	১
মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর	১
পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড	২
বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড	২

যশোর জেলায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক এনজিও-র উন্নয়ন কর্মকাণ্ড রয়েছে। বড় এনজিওগুলোর মধ্যে ব্র্যাক, আশা, কেয়ার-বাংলাদেশ, প্রশিকা, গ্রামীণ ব্যাংক-এর নাম উল্লেখ্যযোগ্য। এ ছাড়া স্থানীয় সক্রিয় এনজিও-র মধ্যে জাগরনী চক্র, আলো, সমাজ কল্যাণ সংস্থা, বাঁচতে শেখা ও নিজেরা করি উন্নয়ণ কর্মকান্ডে ব্যাপক ভূমিকা রেখে চলছে। প্রধান চারটি বড় এনজিও-র ক্ষুদ্রঋণ প্রকল্পের আওতাভূক্ত জেলার মোট ২১% গৃহস্থ। গৃহস্থ প্রতি ঋণের পরিমাণ ৬,৪৭৩ টাকা মাত্র (আইসিজেডএম, ২০০৩)। এ ছাড়া জেলার দু:স্থদের নিরাপত্তা ও সেবা নিশ্চিত করার জন্য সমাজ সেবা অধিদপ্তর এবং বিশ্ব খাদ্য সংস্থা কাজ করছে।

ক্ষুদ্রঋণ গ্রহণকারী গৃহস্থ (জন)	১,০৯,৪৮২
% গৃহস্থ (মোট)	২১%
মোট ঋণের পরিমাণ (কোটি টাকা)	৭০.৮৭
গৃহস্থ প্রতি ঋণের পরিমাণ (টাকা)	৬,৪৭৩

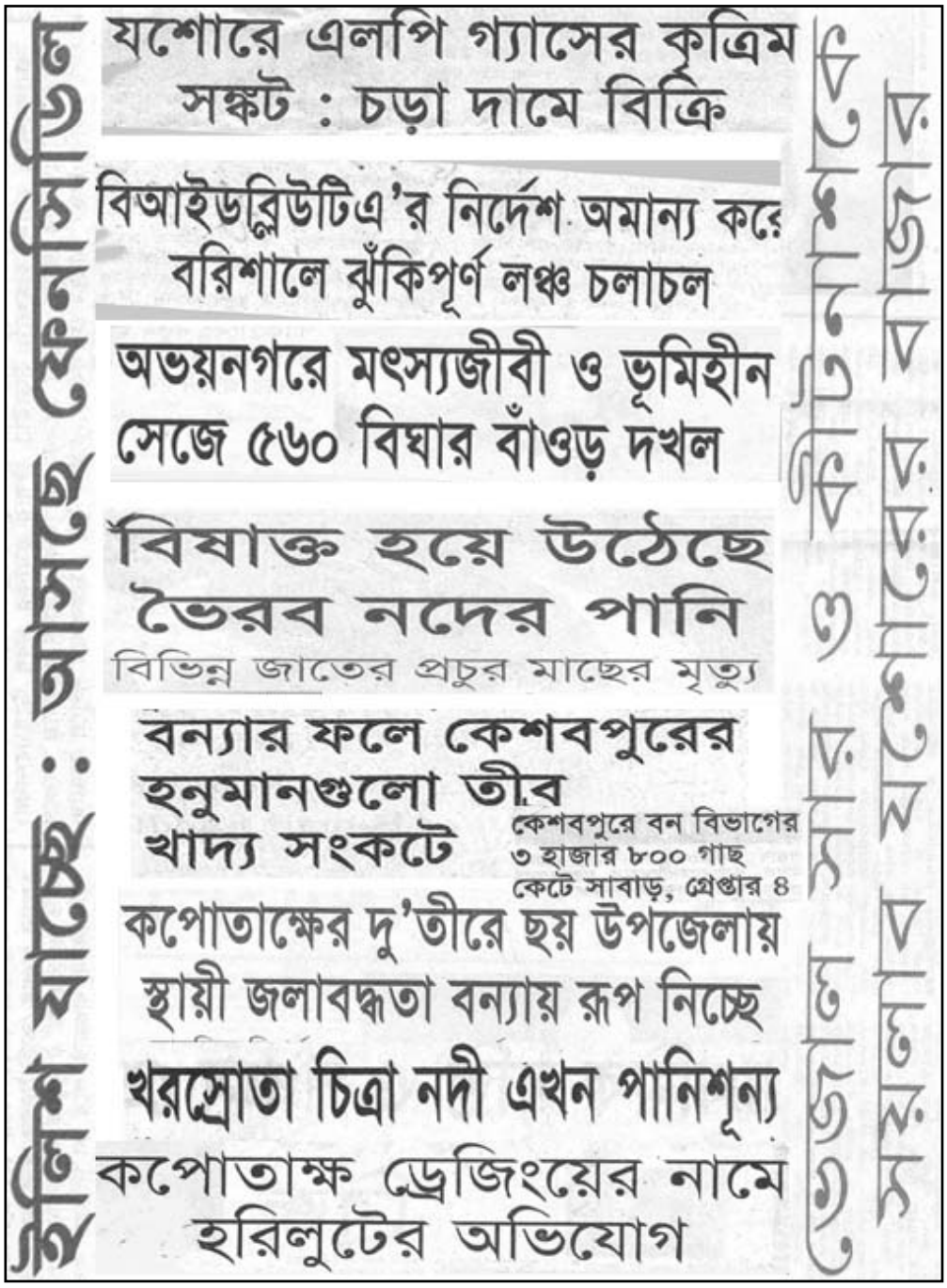

ইলিশ যাচ্ছে : আসছে ফেনসিডিল

যশোরে এলপি গ্যাসের কৃত্রিম সঙ্কট : চড়া দামে বিক্রি

বিআইডব্লিউটিএ'র নির্দেশ অমান্য করে বরিশালে ঝুঁকিপূর্ণ লঞ্চ চলাচল

অভয়নগরে মৎস্যজীবী ও ভূমিহীন সেজে ৫৬০ বিঘার বাঁওড় দখল

বিষাক্ত হয়ে উঠেছে ভৈরব নদের পানি

বিভিন্ন জাতের প্রচুর মাছের মৃত্যু

বন্যার ফলে কেশবপুরের হনুমানগুলো তীব্র খাদ্য সংকটে

কেশবপুরে বন বিভাগের ৩ হাজার ৮০০ গাছ কেটে সাবাড়, গ্রেপ্তার ৪

কপোতাক্ষের দু'তীরে ছয় উপজেলায় স্থায়ী জলাবদ্ধতা বন্যায় রূপ নিচ্ছে

খরস্রোতা চিত্রা নদী এখন পানিশূন্য

কপোতাক্ষ ড্রেজিংয়ের নামে হরিলুটের অভিযোগ

ভেজাল সার ও কীটনাশকে সয়লাব যশোরের বাজার

সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতা

যশোরের মানুষের জীবনে প্রাকৃতিক এবং নিজেদের কারণে সৃষ্ট দুর্যোগ এবং প্রতিবন্ধকতার প্রভাব অপরিসীম। ২০০৩ সালে এই জেলার বিভিন্ন শ্রেণীর লোকজনের সাথে এই বিষয়ে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সমাজের মানুষের বিভিন্ন কার্যকলাপ, সম্পদের বন্টন বা ব্যবহার, উন্নয়ন পরিকল্পনা ও তার বাস্তবায়নের ফলে সৃষ্টি হওয়া কিছু প্রধান সমস্যার কথা আলোচিত হয়। এ ছাড়া মাঠ পর্যায়ের গবেষণা (২০০২, ২০০৩) ও আলোচনা (২০০৩, ২০০৪) থেকে জেলার মানুষের বিভিন্ন সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতার যে চিত্র ফুটে উঠে, তার উল্লেখযোগ্য অংশ এখানে তুলে ধরা হল:

পরিবেশগত সমস্যা

প্রতিবেশী দেশ ভারতের সাথে অভিন্ন নদ-নদীর পানি বন্টন সমস্যা, কচুরিপানাপূর্ণ ডোবা-নালা, ভূ-গর্ভস্থ পানির অত্যধিক আহরণ, অপরিকল্পিত বাঁধ, রাস্তাঘাট নির্মাণ ও সর্বোপরি পরিবেশ সম্পর্কিত জ্ঞানের অভাব জেলার সামগ্রিক পরিবেশকে বিপন্ন করে তুলছে।

পরিবেশগত সমস্যা
- জলাবদ্ধতা
- বন্যা
- লবণাক্ততা
- কাল বৈশাখী
- সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা
- নদী
- আর্সেনিক দূষণ
- জলবায়ুর পরিবর্তন

কৃষি সমস্যা
- সারের উচ্চ মূল্য
- সংস্কারের অভাব
- ভারতীয় সার
- ইলিশ পাচার
- বাঁধে ভাঙন
- বাওড়ে মাছ চাষে অনিয়ম
- মৎস্য ঋণ বিতরনে অনিয়ম
- নদী দূষণ
- মাটির উর্বরতা হ্রাস
- বাঁধ কেটে দেয়া
- চিংড়ি চাষের প্রতিবন্ধকতা

আর্থ-সামাজিক সমস্যা
- বেনাপোল বন্দর ব্যবস্থাপনা
- নগর ও শিল্প দূষণ
- বাগদা চাষ
- বাণিজ্য সংকট
- আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি
- স্বাস্থ্য সেবা
- সংখ্যালঘু সম্প্রদায়

যোগাযোগ
- অবকাঠামোগত সমস্যা

শিল্প ও বাণিজ্য
- বেনাপোল বন্দর

নদী ভরাট : ভারতে গঙ্গার উপর নির্মিত ফারাক্কা বাঁধের কারণে পদ্মা নদী ও তার শাখা নদী, উপনদীগুলো দ্রুত পলি জমে ভরাট হয়ে যাচ্ছে। তাই যশোরের মধ্য দিয়ে বয়ে যাওয়া মধুমতি, নবগঙ্গা, ইছামতি, ভৈরব, আপার ভৈরব, চিত্রা, কপোতাক্ষ, বেতনা ও ভদ্রা নদী আজ স্বাভাবিক পানি প্রবাহ হারাতে বসেছে। পলি ভরাট ও নাব্যতা হ্রাসের কারণে পশ্চিম কেশবপুরে ভদ্রা নদী সম্পূর্ণ শুকিয়ে গেছে। হরিপুর নদীও পলি পড়ে ভরাট হয়ে গেছে। তাই জেলার সার্বিক পানি ব্যবস্থাপনা আজ ভয়াবহ হুমকির সম্মুখীন। জেলায় মাছের উৎপাদন ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়েছে।

জলাবদ্ধতা : জলাবদ্ধতার কারণে কৃষি কাজ ও দৈনন্দিন জীবনযাত্রা ব্যাহত হচ্ছে। প্রতিবছর বর্ষা মৌসুমের শেষে অবিরাম বর্ষণ ও কপোতাক্ষের উজানের পানিতে সৃষ্ট জলাবদ্ধতা বন্যায় রূপ নেয়। এই স্থায়ী জলাবদ্ধতার কারণে কোথাও কোথাও মানবিক বিপর্যয়ের আশংকা দেখা দিয়েছে। জলাবদ্ধতার কারণে অন্তত লক্ষাধিক মানুষ পানিবন্দী অবস্থায় মানবেতর জীবনযাপনে বাধ্য হচ্ছে। একটানা বর্ষণে ও কপোতাক্ষ নদের জোয়ারের পানিতে কেশবপুরের বরণডালি-মিরের ডাঙ্গা বেড়িবাঁধ ভেঙ্গে গিয়ে জলাবদ্ধতা পরিস্থিতি ভয়াবহ রূপ নেয়।

বন্যা : প্রতিবছর যশোর জেলা কম বেশি বন্যায় আক্রান্ত হয়। একটানা কিছুদিন বৃষ্টি হলেই জলাবদ্ধতা বন্যায় রূপ নেয়। ২০০৪ সালের বন্যায় যশোরের অধিকাংশ স্থান তলিয়ে যায়। ফসল, গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির ক্ষতি হয়।

লবণাক্ততা : মাটি-পানির লবণাক্ততার কারণে কৃষকরা সেচের পানি পাচ্ছে না। প্রস্তাবিত নদী সংযোগ প্রকল্প (River Link Project) বাস্তবায়িত হলে ভূউপরিস্থিত পানির লবণাক্ততা আরো বাড়বে বলে আশংকা করা হচ্ছে।

মাটিতে লবণ বেড়ে যাওয়ায় গ্রীষ্মকালীন ফসল (আউশ), শুকনা মৌসুমের ফসল (বোরো) ও রবি শস্য উৎপাদন ব্যাপকভাবে ব্যহত হচ্ছে।

কাল বৈশাখী/টর্নেডো : প্রতি বছর মার্চ থেকে জুন মাস পর্যন্ত কাল বৈশাখীর আশংকা থাকে। কাল বৈশাখীর আঘাতে ক্ষেত-খামার জেলার জনপদ, গো-সম্পদ ও গাছপালার ব্যাপক ক্ষতি হয়।

আর্সেনিক দূষণ : আর্সেনিক দূষণ ক্রমশ বাড়ছে। তাই নিরাপদ পানির সংকট দিনদিন তীব্রতর হচ্ছে। নিরাপদ পানির সংগ্রহের জন্য জেলার নারী-পুরুষদের সীমাহীন দুর্ভোগ পোহাতে হয়।

জলবায়ুর পরিবর্তন : জলবায়ুর পরিবর্তনের কারণে জেলার পেশাজীবী শ্রেণীর জীবন ও জীবিকায় নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে।

জমি ডেবে যাওয়া : জেলায় ভূমি ডেবে যাচ্ছে। ফলে জেলায় বড় ধরনের প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের আশংকা ক্রমশ বাড়ছে।

কৃষি সমস্যা

ফুল চাষের সমস্যা : জেলায় পার্শ্ববর্তী দেশ থেকে সীমান্ত পথে ফুলের প্রবেশ থেমে নেই, যা জেলার ফুল চাষ ও ব্যবসার ক্ষেত্রে হুমকি স্বরূপ। ফুল চাষে সরকারি সহায়তা নেই বললেই চলে। ফুলচাষীরা বীজ, কৌশলগত জ্ঞান, বাজারজাতকরণের সুবিধা আর কোল্ডস্টোরেজের সুবিধা বঞ্চিত। ফুল সংরক্ষণ পদ্ধতি জানা না থাকায় হাজার হাজার টাকা মূল্যের ফুল নষ্ট হয়। এ ছাড়া কীটপতঙ্গের আক্রমণতো আছেই। তাই ফুলচাষীদের পক্ষ থেকে প্রশিক্ষণ, প্রাযুক্তিক সহায়তা এবং আমদানি-রপ্তানির জটিলতা বন্ধের দাবী ওঠছে। যশোর জেলা ফুল চাষী ও ব্যবসায়ী সমিতি ইতিমধ্যেই কৃষি সম্পসারণ অধিদপ্তরের কাছে এই ব্যাপারে সহায়তা চেয়েছে।

সারের উচ্চ মূল্য : যশোরে সারের উচ্চ মূল্য ইরি বোরো ধান চাষের ক্ষেত্রে একটি প্রধান বাঁধা হিসেবে চিহ্নিত। পাইকারী বাজারে সারের দাম বেড়ে যাওয়ায় জেলায় সারের কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি হয়। ফলে ইরি বোরো ধান চাষ ব্যাহত হয়। প্রতি বছর ইরি বোরো বোনার মৌসুমে বীজ, সার ও জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধিতে কৃষকরা দিশেহারা হয়ে পড়ে।

ভারতীয় সার : যশোর জেলায় ভারতীয় সারে স্থানীয় বাজার সয়লাব হয়ে গেছে। ভারতের হাওড়া ও বনগাঁ এলাকায় তৈরি বিভিন্ন কীটনাশক ও রাসায়নিক সার দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্তে নানা বর্ডার পয়েন্টে যেমন গোগা, পুটখালি, সাদিপুর, কলারোয়া, চান্দুরিয়া, রামকৃষ্ণপুর, ইদারপুর, বর্ণী, ধুলিয়ানি, মহেশপুর এবং দর্শনা দিয়ে অতি স্বল্প দামে যশোরে প্রবেশ করে।

দুর্বল অবকাঠামো : জেলার খাল-নালা স্লুইস গেটের সংস্কারের অভাবে সেচ সংকট সৃষ্টি হয়। জোয়ারের পানি খাল-নালায় ঢুকতে না পারায় কৃষকদের পাম্প চালিত সেচের উপর নির্ভর করতে হয়। আর তাই কৃষি কাজ চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।জেলার উল্লেখযোগ্য খাল-নালা পুন:খনন ও সংস্কারের অভাবে শুকিয়ে যাচ্ছে। কৃষকরা সেচ সংকটে ভুগছেন। ফলে তারা ফসল উৎপাদনে লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ব্যর্থ হচ্ছেন।

ইলিশ পাচার : যশোরের বেনাপোল সীমান্ত পথে পাচার হয়ে যাচ্ছে মেঘনার ইলিশ। বরিশালের বাজার থেকে স্বল্প দামে কেনা ইলিশ যশোরের শার্শার পুটাখালী, গোগা, গাতিপাড়া, সাদীপুর, রঘুনাথপুর, শিকারপুর, বড় আঁচড়া ও

ঘিবা রুটে প্রতিদিন ভারতে পাচার হয়। পশ্চিমবঙ্গের কয়েকজন এবং যশোর ও বেনাপোলভিত্তিক চোরাচালান সিন্ডিকেটের কয়েকজন সদস্যের যোগসাজশে এই ইলিশ পাচার সংগঠিত হয়ে আসছে। উল্লেখ্য, বেনাপোল সীমান্ত চেকপোস্ট দিয়ে যে পরিমাণ ইলিশ রপ্তানি হয় তার চেয়ে বেশি পাচার হয় চোরাই পথে। তাই দেশীয় বাজার ইলিশশূন্য হয়ে পড়ছে। জেলার মৎস্য খাতে আয় কমছে।

বাঁধে ভাঙন : কেশবপুরে কপোতাক্ষ অববাহিকায় নির্মিত সরসকাঠি-মীরেরডাঙা বাঁধে ভাঙন অব্যাহত রয়েছে। যশোরের কেশবপুরের ত্রিমোহিনী ইউনিয়নে কপোতাক্ষ নদের তীরে স্বেচ্ছাশ্রমে নির্মিত বরনতালী মির্জানগর বাঁধ ভেঙে বিস্তীর্ণ জনপদ তলিয়ে গেছে। পর্যাপ্ত রক্ষণাবেক্ষণ ও সংস্কারের অভাবে এটি ঘটছে।

বাওড়ে মাছ চাষে অনিয়ম : বাওড়ে মাছ চাষে অনিয়মের কারণে প্রকৃত মাছ চাষীরা সংকটের মুখে পড়ছে। জেলার অভয়নগরে ৫৬০ বিঘার পুড়াখালী বাওড়ে মাছ চাষ সম্প্রসারণের যে উদ্যোগ নেয়া হয়েছে তাতে প্রকৃত মাছ চাষী ও ভূমিহীনরা যুক্ত হতে পারছে না। নিয়ম বহির্ভূতভাবে এলাকার ধনাঢ্য, ক্ষমতাসীন ও বিরোধীদলীয় প্রভাবশালী নেতাকর্মী ও স্কুল-কলেজের ছাত্ররা এই বাওড়ের সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী বাওড়ের সদস্য হবে স্থানীয় মৎস্যজীবী ও ভূমিহীন (যাদের জমি ০.৫ একরের কম)। অথচ অনুসন্ধানে জানা যায়, পুড়াখালী বাওড়ের ১০৮ জন সদস্যের মধ্যে মাত্র ১৫ জন প্রকৃত মৎস্যজীবী ও ভূমিহীন।

মৎস্য ঋণ বিতরণে অনিয়ম : ২০০২ সাল থেকে সরকারের বিশেষ বিনিয়োগ কমসূচীর আওতায় মাছ চাষ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে জেলার মৎস্যচাষীদের মধ্যে ঋণ দেয়া শুরু হয়। মৎস্য চাষীদের মধ্যে ঋণ বিতরণে অনিয়ম ও স্বেচ্ছাচারিতার অভিযোগ রয়েছে। স্থানীয় দালালরা মৎস্য ঋণ পাইয়ে দেয়ার নামে বিভিন্ন ব্যক্তির সাথে চুক্তি করে কাগজে কলমে রাতারাতি "প্রকৃত" মৎস্যচাষী সমিতি গঠন করে এবং ঋণের জন্য আবেদন করে। কর্তৃপক্ষ কোন রকম যাচাই না করে ঋণ বরাদ্দ ও বিতরণ করে। প্রকৃত মাছচাষীদের ব্যক্তিগত মাছের খামার বা জলাশয় থাকলেই তারা সমিতি গঠন করতে সক্ষম ও ঋণ পাওয়ার যোগ্য। মাছ চাষীরা ঋণের অভাবে মাছ চাষ করতে পারছে না।

চিংড়ি চাষের প্রতিবন্ধকতা : চিংড়ি চাষের উজ্জ্বল সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও সরকারি পর্যায়ে কোন উপযুক্ত পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে না। আর তাই চিংড়ি চাষীদের পুঁজির অভাব, উন্নত পোনার সংকট, খাস জমি বন্টন সমস্যা, ব্যাংক ঋণের অভাব, নিরাপত্তাহীনতা আর কৌশলগত জ্ঞান বা প্রশিক্ষণের অভাবে জেলার চিংড়ি চাষ ব্যাহত হচ্ছে।

নদী দূষণ : যশোরের প্রধান নদীগুলো দূষণের শিকার। নোয়াপাড়া ফুলতলা পয়েন্টে ভৈরব নদীর পানি মারাত্মকভাবে দূষিত হয়ে পড়ছে। সেখানে মাছের মড়ক শুরু হয়েছে।

মাটির উর্বরতা হ্রাস : সার ও কীটনাশকের অতি ব্যবহারে জমির উর্বরতা কমছে। ফলে ইরি ও রোরো ধানের উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে।

বাঁধ কেটে দেয়া : বন্যার পানি সরিয়ে দেবার জন্য বাঁধের ভেতরের ও বাহিরের বাসিন্দাদের এই স্থানীয় উদ্যোগে এক পক্ষ লাভবান হলেও আরেক পক্ষ চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

আর্থ-সামাজিক সমস্যা

নগর ও শিল্প দূষণ : যশোর নগরীতে পরিবেশ দূষণ বাড়ছে। বর্জ্য ব্যবস্থাপনার অভাব, অপর্যাপ্ত নালা নিষ্কাশন, গলি-ঘুপচির দুঃসহ পরিবেশ দূষণের অন্যতম কারণ।

বাগদা চাষ : অপরিকল্পিত বাগদা চাষ জেলার পরিবেশগত বিপন্নতাকে বাড়িয়ে তুলছে। চিংড়ি চাষীরা জমিতে লোনা জল ঢুকিয়ে চিংড়ি চাষের চেষ্টা চালায়। এতে মাটি লবণাক্ত হয়ে পড়ছে। জমিগুলো ফসল চাষের অনুপযুক্ত হয়ে পড়ছে।

বাণিজ্য সংকট : জেলায় চিংড়ি উৎপাদন বৃদ্ধি পেলেও বাণিজ্য সংকট সৃষ্টি হচ্ছে। মাছ রপ্তানির ক্ষেত্রে অসাধুতা ও প্রতারণা অন্যতম কারণ। একই সাথে চিংড়ি ঘেরে ভাইরাসের আক্রমণ, অবৈধ ঘের, ঘের দখল, আইন-শৃঙ্খলার অবনতি, ফসল নষ্ট, রেণু পোনা নষ্ট চিংড়ি শিল্পের ক্ষতিকর প্রভাব হিসেবে বিবেচিত।

আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি : যশোর নগরে সংঘবদ্ধ অপরাধী চক্রের অপতৎপরতা লক্ষণীয়। চাঁদাবাজি, সন্ত্রাস, হুমকি, ছিনতাই ইত্যাদি সেখানের নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। গ্রামাঞ্চল বাংলা কমিউনিস্ট পার্টির অপতৎপরতায় জিম্মি হচ্ছে স্থানীয় নেতা-কর্মী, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকেরা।

যশোরে কোন কোন অঞ্চলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকেরা নিরাপত্তাহীনতায় দিন কাটায়। এলাকার প্রভাবশালী সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের হুমকির মুখে অনেকেই পৈত্রিক ভিটেবাড়ী ছেড়ে দিতে বাধ্য হচ্ছে।

বিপদাপন্নতা : বিপদাপন্নতা সমীক্ষা (সিইজিআইএস, ২০০৩)-তে জেলার প্রধান জীবিকা প্রধানত প্রাকৃতিক, ভৌত ও সামাজিক বিপদাপন্নতার শিকার। এর ফলে জেলে, ক্ষুদ্র কৃষক, চিংড়ি চাষী ও মজুরদের জীবন ও জীবিকায় নিরাপত্তাহীনতা প্রকট হয়ে উঠছে।

অপর্যাপ্ত স্বাস্থ্য সেবা : অপ্রতুল যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে যশোরের জনগণ পার্শ্ববর্তী স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র থেকে সেবা নিতে পারে না। হাসপাতালগুলোতে পর্যাপ্ত সেবা ও ঔষধের অভাব আছে।

যোগাযোগ

অবকাঠামোগত সমস্যা : গ্রামীণ এলাকার রাস্তাঘাটের অবস্থা ভাল নয়। বর্ষা মৌসুমে এখানে রাস্তাঘাট ডুবে যায়। মানুষের দুর্দশা চরমে পৌঁছে।

শিল্প ও বাণিজ্য

বেনাপোল বন্দর ব্যবস্থাপনা : বেনাপোল বন্দরে অনিয়ম আজ একটি সাধারণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই মাল খালাসে প্রায়ই বিলম্ব হয়। শত শত ভারতীয় ট্রাক বেনাপোল বন্দরের ২৭টি শেডে আটকে পড়ে থাকে। দৈনিক ৩০০টি ভারতীয় ট্রাক বেনাপোল স্থলবন্দরে প্রবেশ করে। আমদানীকারকরা সময় মতো মাল খালাস করতে না পারলে সেখানে প্রায়ই যানজট সৃষ্টি হয়। এ ছাড়া কর্তৃপক্ষের চোখে ফাঁকি দিয়ে বিপুল পরিমাণে পণ্যদ্রব্য ও দাহ্য পদার্থ যেমন এসিড আমদানি ও সরবরাহ অব্যাহত রয়েছে।

পণ্য বাজারজাতকরণের সমস্যা : বাংলাদেশ পাটকল করপোরেশন (বিজেএমসি)-র তত্ত্বাবধানে পরিচালিত "যশোর জুট ইন্ডাস্ট্রিজ" মারাত্মক অর্থ সংকটের মুখে রয়েছে। প্রয়োজনমাফিক পাট কিনতে ব্যর্থ হওয়ায় ও ৬

কোটি টাকা মূল্যের ১ হাজার ৫০০ মেট্রিক টন পাটজাত পণ্য বিক্রি করতে না পারায় পাটকলটি নাজুক অবস্থায় রয়েছে।

ফুলের বাজারজাতকরণ : জেলার ফুল চাষীরা ন্যায্য বাজারদর এবং আর্থিক সহায়তার অভাবে ফুল চাষে আগ্রহ হারিয়ে ফেলছে। যশোর সীমান্তে পাচার হয়ে আসা ভারতীয় ফুলে ছেয়ে যাচ্ছে স্থানীয় বাজার।

যশোরের চাঁচড়ায় পোনা বিক্রির হাট জমে উঠেছে

বিভিন্ন জেলা থেকে আসতে শুরু করেছেন মাছচাষিরা

শামুক এখন অর্থকরী সম্পদ

Shrimps grow with carps

Dipok's success in Jessore opens new chapter in shrimp cultivation

যশোরের ফুলচাষিরা মুষ্টি ব্যবসায়ীর কাছে জিম্মি

রাসায়নিক কীটনাশকের বিকল্প আসছে

বিষ নয়, ফাঁদে আটকে ক্ষতিকর কীট দমন

যশোরের টেকনিশিয়ান রাব্বির আর্সেনিক-আয়রনমুক্ত পানি

দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে অর্থকরী বিকল্প ফসল হিসেবে মেলে চাষ হচ্ছে

Safe water being supplied to people of 3 Jessore villages

সম্ভাবনা ও সুযোগ

জেলা ও মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন স্তরের গণমানুষের সাথে আলাপ-আলোচনা ও মতবিনিময়ের (২০০৩) মাধ্যমে জেলার প্রধান সম্ভাবনাময় দিকগুলোর স্পষ্ট ঈঙ্গিত মেলে। প্রাকৃতিক সম্পদ ও জনউদ্যোগের কয়েকটি সম্ভাবনাময় দিক এখানে আলোচিত হল।

কৃষি

ধান ক্ষেতে মাছ চাষ : ধান ক্ষেতে মাছ চাষে বেশি মুনাফা অর্জন করা সম্ভব। তাই প্রশিক্ষণ ও সচেতনতা নিশ্চিত করা গেলে কৃষকরা এই উৎপাদনমুখী চাষ পদ্ধতিতে আরো আগ্রহী হয়ে উঠবে।

সমন্বিত কীট পতঙ্গ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি/Integrated Pest Management (IPM) : জেলার ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি করতে IPM পদ্ধতি ব্যাপক সহায়ক ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়। এর মাধ্যমে একজন কৃষক স্বল্প ও পরিমিত রাসায়নিক সার প্রয়োগের মাধ্যমে অধিক ফসল উৎপাদনে সক্ষম।

সবজি চাষ : জেলার উর্বর মাটি নানা ধরনের সবজি চাষের উপযুক্ত। স্থানীয় চাহিদা পূরণের পরে সারা দেশে যশোর থেকে সবজি সরবরাহ করা হয়। সবজি চাহিদা ও যোগান ক্রমাগত বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

পোনা উৎপাদন : কৃষিখাতে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে পোনা উৎপাদন ব্যাপক ভূমিকা রাখছে। মৎস্য বিভাগ ও যশোর ব্যবসায়ী সূত্রে জানা যায়, একমাত্র চাঁচড়া থেকেই সারা দেশের চাহিদার ৬০% -৭০% পোনা সরবরাহ করা হয়। চাঁচড়ায় ছোট বড় ৮০টি হ্যাচারী, ১০০০ এর বেশি নার্সারি ও সমসংখ্যক থাকায় ৬০-৪০ হাজার লোক রেণু ও পোনা উৎপাদনে নিয়োজিত রয়েছে।

ফুল চাষ : যশোর জেলায় ফুলের চাষকে ঘিরে ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে। কেননা জেলায় উৎপাদিত ফুল যথাযথ প্রযুক্তিগত সহায়তায় বাইরে রপ্তানি করা যায়। মধ্যপ্রাচ্য ও ইউরোপে বাংলাদেশের ফুলের রপ্তানি সম্ভাবনা রয়েছে। সরকারের যথাযথ সহায়তায় ফুল রপ্তানি থেকে বিপুল অর্থ আয় করা সম্ভব।

চিংড়ি চাষ : জেলার চিংড়ি চাষের ব্যাপক সম্ভাবনা আছে। পরিবেশ বান্ধব চিংড়ি চাষের প্রাথমিক পর্যায় অর্থাৎ হ্যাচারীতে পোনা উৎপাদন থেকে শুরু করে চিংড়ি প্রক্রিয়াজাতকরণের সময় পর্যন্ত প্রতিটি ধাপে সনদপত্র প্রদানের ব্যবস্থা থাকলে মানসম্মত চিংড়ি উৎপাদন ও রপ্তানি নিশ্চিত করা যাবে।

হ্যাচারী : যশোর জেলায় আরো কয়টি হ্যাচারী স্থাপন করার সুযোগ ও সম্ভাবনা আছে। চিংড়ি চাষ বৃদ্ধি পেলে পোনার চাহিদা বাড়বে এবং কক্সবাজারের পোনার উপর নির্ভরশীলতা কমে যাবে।

মৎস্য অভয়ারণ্য : চতুর্থ মৎস্য প্রকল্প, ১৯৯৯ (মৎস্য অধিদপ্তর)-এর তথ্য অনুসারে সমগ্র খুলনা জেলার মোট ২টি উপজেলায় মোট ১,০৭৫ হে. এলাকায় মৎস্য অভয়ারণ্য স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে। বছরের নির্দিষ্ট সময়ে খাল বিল নদীর নির্দিষ্ট অংশে মাছ না ধরার স্থানীয় চর্চার সাথে মৎস্য অভয়ারণ্য স্থাপনের উদ্যোগ জেলার মাছের

উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে নি:সন্দেহে। এতে স্থানীয় ও দেশের চাহিদা পূরণ ছাড়াও মৎস্য খাতে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাবে।

জোয়ার আঁধার (Tidal Basin) : জেলার বড় বড় বিলগুলোকে জোয়ার আঁধার বা (Tidal Basin)-এ রূপান্তরিত করে নদীগুলোর নাব্যতা বা স্বাভাবিক প্রবাহ নিশ্চিত করা যায়। যশোরের বিল কেদারিয়ায় এর সফল বাস্তবায়ন করা হয় ২০০২ সালের জানুয়ারি মাসে। জেলার নদ-নদীগুলোর পলি ভরাট ও পার্শ্ববর্তী এলাকার জলাবদ্ধতার সমস্যা নিরসনে Tidal Basin প্রক্রিয়া কার্যকর হতে পারে।

আর্থ-সামাজিক

বাঁধ সংরক্ষণ : বাঁধ সংরক্ষণে সাধারণ মানুষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। উল্লেখ্য, ছোট খাটো সংস্কার কাজ, ভাঙন প্রতিরোধ জনসচেতনতা সৃষ্টিতে এলাকাবাসী সহায়ক ভূমিকা রেখে চলেছে।

ভূমি ব্যবহার : স্থানীয় জনসাধারণের অংশগ্রহণে জেলার ভূমি ব্যবহারের পরিকল্পনা তৈরী হতে পারে যাতে চিংড়ি ও ধান চাষ সমন্বিত হবে।

নগরায়ন : বিভিন্ন নাগরিক সুবিধা যেমন, একযোগে বিদ্যুৎ, পানি, রেল-নৌ-সড়ক ও আকাশ পথে যোগাযোগের সুবিধা জেলার কৃষি ও অর্থনীতিতে সাফল্য বয়ে আনছে।

ক্রীড়াঙ্গন : যশোরের ক্রীড়াঙ্গনকে সমৃদ্ধ করতে যশোর শামস-উল-হুদা স্টেডিয়ামকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এ ছাড়া সাম্প্রতি "আমেনা খাতুন ক্রিকেট গ্যালারী" ও প্রেস বক্সের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হয়।

শিল্প ও বাণিজ্য

স্থল বন্দর : সীমান্তবর্তী জেলা হওয়ার কারণে প্রতিবেশী দেশ ভারতের সাথে সীমান্ত পথে যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে। যশোর-বেনাপোল স্থল বন্দর বা চেকপোস্ট দেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চেকপোস্ট। উল্লেখ্য, বাণিজ্য ও পর্যটন সুবিধা নিশ্চিত করেছে বেনাপোল স্থল বন্দর। এই বন্দরের অর্থনৈতিক অবদান ভবিষ্যতে আরো বাড়বে।

কৃষিভিত্তিক শিল্প : যশোর জেলায় কৃষিভিত্তিক শিল্প ও বাণিজ্য বিকাশের সম্ভাবনা রয়েছে। জেলায় উৎপাদিত পাটের উপর ভিত্তি করে পাটজাত শিল্প কারখানা স্থাপিত হতে পারে।

ব্যক্তিখাত : জেলায় গত ২০ বছরে ব্যক্তিখাতের কার্যকলাপ ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পেয়েছে। কৃষি পণ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও রপ্তানিসহ পর্যটন শিল্পে ব্যক্তিখাতের অংশগ্রহণ জেলার অর্থনীতির উন্নয়নে সহায়তা করবে।

শিল্পাঞ্চল : প্রতিটি উপজেলায় শিল্পাঞ্চল গড়ে তুলতে পারলে একদিকে যেমন কর্মসংস্থানের সুযোগ হবে এবং অন্যদিকে উৎপাদন বাড়বে। এতে জেলার অর্থনীতি জোরদার হবে।

প্রাকৃতিক সম্পদ

জলাভূমি : জেলার উৎপাদিত মাছের অধিকাংশই আসে পুকুর-জলাশয় থেকে। তাই জলাভূমি সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা ও যথাযথ ব্যবহারে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব।

নদী-নালার মাছ : নদী-নালা ও খালের মাছ জেলার অনন্য সম্পদ। নদীর নাব্যতা রক্ষা ও জেলেদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টিতে এই প্রাকৃতিক সম্পদ থেকে ব্যাপকভাবে লাভবান হবার সম্ভাবনা আছে।

যোগাযোগ

যশোর জেলার যোগাযোগ ব্যবস্থা অন্যান্য উপকূলীয় জেলার তুলনায় অনেক ভাল। কেননা একমাত্র যশোর জেলাই একাধারে সড়ক, রেল, নৌ ও আকাশ পথে দেশের বিভিন্ন অঞ্চল ও প্রতিবেশী দেশে ভারতের সাথে সংযুক্ত।

সড়ক, রেল যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন : রাস্তাঘাটের উন্নয়ন ও সরাসরি রেল যোগাযোগ স্থাপনের ফলে ব্যবসা-বাণিজ্য, যাতায়াতের উন্নয়ন ও আঞ্চলিক দূরত্ব কমে গেছে।

নৌ/নদী বন্দর : ভাটিতে নদী বন্দর বা ঘাটের সংখ্যা বাড়ানো হলে জেলার উৎপাদিত বা আহরিত কৃষিপণ্য বাজারজাত করার সুবিধা বাড়বে এবং নদী তীরবর্তী এলাকার মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অভাব ঘুচবে।

পর্যটন শিল্প

জেলার শহর ও গ্রামাঞ্চলে অসংখ্য প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক নিদর্শন আছে। ঐতিহ্য নির্ভর এই স্থানগুলোকে কেন্দ্র করে জেলায় পর্যটন আকর্ষণ গড়ে ওঠার সম্ভাবনা প্রবল। কেননা জেলা সৃষ্টির শুরু থেকেই এটি নানা শাসক ও রাজ্যের অধীনে থাকার কারণে এর পুরাতাত্ত্বিক ইতিহাস অত্যন্ত বর্ণময়। আর তাই ঐতিহাসিক স্থান ও পুরাকীর্তিগুলোর প্রত্নতাত্ত্বিক মূল্যও অপরিসীম।

ভবিষ্যতের রূপরেখা

বর্তমান জনসংখ্যা ২৪ লাখ ৬৯ হাজার থেকে ২০১৫ সালে হবে ৩০ লাখ ২৭ হাজার এবং ২০৫০ সালে ৪৩ লাখ ২৬ হাজার। মাত্র ১৫ বছরে লোক সংখ্যা বাড়বে .৫৫ লাখ। ২০১৫ সালে, বাংলাদেশের দারিদ্র্যবিমোচন কৌশল বাস্তবায়নের শেষ বছর। জেলার জনসংখ্যার ৫২% পুরুষ এবং ৪৮ নারী আর ৮৩% গ্রামীণ জনগোষ্ঠী এবং ১৭% শহুরে জনগোষ্ঠী।

এই বিপুল জনগোষ্ঠীর জন্য এবং জেলার অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যে কর্মসংস্থানের নানান পথ তৈরী করতে হবে। জেলার উন্নয়নে যে সমস্ত সম্ভাবনাকে কাজে লাগানো যায় তা হল কৃষি, মাছ উৎপাদন, চিংড়ি উৎপাদন, পর্যটন সম্ভাবনা ইত্যাদি। অন্যদিকে নদীভাঙন, আর্সেনিক দূষণ, বাঁধ ও অন্যান্য অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ, বন্যা নিয়ন্ত্রণসহ জলাশয় ব্যবস্থাপনার বিষয়ে বিশেষ মনযোগ দেয়া যায়।

যশোর জেলার নদ-নদীর নাব্যতা নিশ্চিত করতে যথাযথ সমীক্ষা, উপযুক্ত প্রযুক্তি ও কৌশল, গণমানুষের ঐকান্তিক সহযোগিতা কার্যকরী হবে বলে আশা করা যায়। ভবিষ্যতে নদী ভরাট থেকে সৃষ্টি হওয়া প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন, জলাবদ্ধতা ও বন্যা প্রতিরোধ প্রতিটি সমস্যার আঞ্চলিক ও স্থানীয় কারণ অনুসন্ধান, মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণ আশাবাদী ভূমিকা রাখবে।

যশোরের মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে নিরাপদ পানি সুবিধা নিশ্চিত করতে স্বল্প মূল্যের আর্সেনিক প্রতিরোধ কৌশল, পুকুর-জলাশয় প্রকল্প গ্রহণ, জনসচেতনতা বৃদ্ধি, স্বল্প সুদে পানি বিশুদ্ধকরণ পদ্ধতি ও দুর্গত এলাকায় পাইপ লাইনে পানি সরবরাহের ব্যবস্থা, সরকারি বেসরকারি পৃষ্ঠপোষকতা ও স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ সহায়ক হবে।

কৃষকদের কৃষি ঋণ, কৃষি উপকরণ, কৃষি প্রশিক্ষণ, সমন্বিত ধান মাছ চাষ পদ্ধতির প্রসার, নারী-পুরুষদের IPM পদ্ধতির উপর প্রশিক্ষণ, কৃষিপণ্য বাজারজাত ও গুদামজাতকরণ নিশ্চিত করাসহ চরাঞ্চলে ও জেলার প্রত্যন্ত জনপদের জলাবদ্ধতা দূর করে এক ফসলী জমিগুলোকে দুই বা তিন ফসলী জমিতে রূপান্তরের মাধ্যমে জেলার কৃষি নির্ভর অর্থনীতির উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব হবে।

যশোরের বিল-বাঁওড় ও নদী-নালার মছের প্রাচুর্য্য ধরে রাখতে মৎস্য আইন প্রয়োগ, নদী ভরাট ও দূষণ প্রতিরোধ ভবিষ্যতে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

অতি সম্প্রতি সরকারের উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধি দলের সাথে আইইউসিএন-এর এক সংলাপ অনুষ্ঠানে বলা হয়, সরকার যথাযথ সহায়তা দিলে ২০০৮ সাল নাগাদ চিংড়ি রপ্তানি থেকে বর্তমানের তুলনায় পাঁচ গুন বেশি রপ্তানি আয় করা সম্ভব। এতে আরো বলা হয়, দেশের চিংড়ি চাষে সম্পৃক্ত জনগোষ্ঠীর মধ্যে মানসম্পন্ন পরিবেশ বান্ধব ও সামাজিকভাবে অনুকূল চিংড়ি চাষ প্রক্রিয়ার প্রচারণা ও চর্চা প্রয়োজন। উল্লেখ্য, সম্ভাবনাময় চিংড়ি উৎপাদনকারী জেলা হিসেবে যশোরে এর যথার্থ প্রয়োগ জেলার কৃষি অর্থনীতি জোরদার করবে।

ক্ষুদ্র শিল্প কল কারখানার পাশাপাশি ভারী শিল্প কারখানা স্থাপন করতে পারলে নদী বন্দরভিত্তিক বাণিজ্য সম্ভাবনা বিকাশের পথ আরো সুগম হবে। তাই যে সমস্ত কারণে জেলার ঐতিহ্যবাহী শিল্প কারখানাগুলো আজ নানা ধরনের অনিয়ম ও জটিলতার শিকার, সেটি যাচাই করে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারলে ভবিষ্যতে জেলার শিল্প উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে।

এ ছাড়া জেলার ৮টি উপজেলায় ৮টি শিল্পাঞ্চল করা যেতে পারে। শিল্পাঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত শিল্প কারখানায় জেলায় প্রাপ্ত কাঁচামাল যেমন, মাছ, কাঠ, অন্যান্য সামুদ্রিক কাঁচামাল, কৃষিপণ্য ইত্যাদি ব্যবহৃত হবে। রাস্তা-ঘাট, বন্দর, বিদ্যুৎ, যোগাযোগসহ নিরাপত্তা এবং অন্যান্য সমস্ত সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করে উপজেলার প্রবাসী ব্যক্তিবর্গকে বিনিয়োগে উৎসাহিত করা সম্ভব। উপজেলার প্রবাসী বাংলাদেশীগণ একদিকে যেমন বিনিয়োগ করতে পারবে অন্যদিকে প্রবাসে থাকার কারণে রপ্তানিতে ভূমিকা রাখতে পারবে। বস্তুত, সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করতে পারলে এই উদ্যোগ যশোরের অর্থনীতিতে বিরাট সাফল্য নিয়ে আসবে।

দর্শনীয় স্থান

প্রাচীন যশোর রাজ্য বা পীঠস্থান একাধারে হিন্দু, মোগল, ইংরেজ শাসকদের অধীনে ছিল। প্রতিটি শাসন অধ্যায়ে শাসকরা তাদের নিজ নিজ কীর্তি ও সংস্কৃতির কিছু চিহ্ন রেখে গেছেন। ঐতিহাসিক ও পুরাকীর্তির এই মূল্যবান নিদর্শনগুলো অকালে অযত্নে আজ নিশ্চিহ্ন হতে চলেছে। কেননা ঐতিহ্য নির্ভর নিদর্শনগুলো আজ প্রাকৃতিক ও মানুষের কারণে ব্যাপক হুমকির সম্মুখীন। অথচ যথাযথ সংরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে এসব প্রাচীন শিল্প ও স্থাপত্যের পর্যটন মূল্য বাড়ানো সম্ভব। জনসচেতনতা সৃষ্টি ও সরকারি-বেসরকারি পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে যশোর জেলায়ও গড়ে উঠতে পারে দর্শনীয় ও পর্যটন স্থান।

কায়েমখোলা : ঝিকরগাছা উপজেলার কায়েমখোলা গ্রামে সুলতানী আমলের একটি ভগ্নপ্রায় মসজিদ রয়েছে। তিন গম্বুজবিশিষ্ট এই মসজিদটির কোন মিনার নেই। এই প্রাচীন মসজিদটি মোগল সাংস্কৃতির সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

অভয়নগরের রাজবাড়ি : খুলনা সীমান্তে কসবা গ্রামের উত্তরে অভয়নগরে একসময় একটি রাজবাড়ি ও ১১টি শিব মন্দির ছিল। বর্তমানে, কেবলমাত্র শিবমন্দিরগুলোর ধ্বংসাবশেষ খুঁজে পাওয়া যায়। কিংবদন্তী রয়েছে, চাঁচড়া রাজবাড়ির এক বিধবা রাজকন্যা অভয়া'কে ধনসম্পত্তি দান করা হয় এবং তার নাম অনুসারেই গ্রামটির নাম হয়ে যায় অভয়নগর।

শুভঢাড়া মসজিদ : অভয়নগর উপজেলায় ধূলগ্রাম থেকে ৫ মাইল উত্তরে ভৈরব নদীর তীরে শুভঢাড়া মসজিদটির ধ্বংশাবশেষ এখনো রয়ে গেছে। চারকোণে মিনার বিশিষ্ট এই ছোট মসজিদটি খান-ই জাহানের আমলে নির্মাণ করা হয় বলে জনশ্রুতি রয়েছে। কেননা উলুঘ-খান-জাহান বারোবাজার থেকে মুরশি কসবা হয়ে পয়োগ্রাম কসবা যাবার পথে এই মসজিদটি নির্মাণ করেন। কিন্তু ঐতিহাসিকরা মসজিদের গঠন ও স্থাপত্যরীতি পর্যবেক্ষণে বলেন, মসজিদটি আসলে উলুঘ-খান-জাহান-এর কোন অনুচর দ্বারা তৈরি।

সাগর দাঁড়ি : কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের জন্মস্থান সাগর দাঁড়ি কপোতাক্ষ নদীর তীরে অবস্থিত। সাগর দাঁড়িতে কবির পূর্ব পুরুষদের ভিটে বাড়ি সংরক্ষিত আছে। উল্লেখ্য, এটি বর্তমানে একটি দর্শনীয় ও পর্যটন স্থানে পরিণত হয়েছে।

গড়ইখালি : একটি বিখ্যাত রেলওয়ে স্টেশন। ঝিকরগাছার ৫ কি.মি. দক্ষিণ-পশ্চিমে এটি অবস্থিত। গড়ইখালির বোধপাড়ায় একটি প্রাসাদের ধবংসাবশেষ খুঁজে পাওয়া যায়। জনমত অনুসারে এটি নওয়াপাড়ার জমিদার পরিবারের পূর্বপুরুষ কমল নারায়ণ রায়ের বসতবাড়ি।

মিরজা নগর : কেশবপুর উপজেলা থেকে ৮ কি.মি. দক্ষিণে অবস্থিত মিরজা নগর গ্রামটি মোগল আমলের স্মৃতি চিহ্নে পরিপূর্ণ। মোগল আমলে যশোরের ফৌজদার মির্জা সফসি খান ত্রিমোহিনীর কাছে আবাসবাটি তৈরি করায় স্থানটি মিরজা নগর নামে পরিচিত হয়। এখানে নবাব বাড়ির ভগ্নাবশেষ রয়েছে। উল্লেখ্য, যশোরের অন্যান্য ফৌজদাররা এখানে বসবাস করতেন।

কোটচাঁদপুর : যশোর জেলায় ২৮ কি.মি. দক্ষিণ-পশ্চিমে কপোতাক্ষ নদীর তীরে অবস্থিত কোটচাঁদপুর হাট-বাজারে সুপরিচিত একটি জনপদ। কেননা এটি চিনি, ধান ও চালের বড় বাজার। বরিশাল থেকে আনা ধানচালের কেনা-বেচা হয় এই কোটচাঁদপুরে। এখানকার খেজুরের গুড়ের বাণিজ্যিক কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এখানে একটি পুরনো ও ঐতিহ্যবাহী রেলওয়ে স্টেশন রয়েছে।

বিদ্যানন্দ কাঠি : যশোর জেলা থেকে ৩৮ কি.মি. দক্ষিণ-পশ্চিমে এবং কেশবপুর উপজেলার ৬ কি.মি. পশ্চিমে বিদ্যানন্দকাঠি গ্রামটি অবস্থিত। একসময়ে এই গ্রামেই যশোরের নামজাদা অবস্থাপন্ন ব্যক্তিদের বসতি ছিল। তারই স্মৃতিচিহ্ন বহন করে চলেছে একটি প্রাচীন দূর্গের ভগ্নাবশেষ, ভাঙা প্রাচীর এবং বিশালদীঘি। জনশ্রুতি রয়েছে ধর্মপ্রচারক উলুঘ-খান জাহান সুন্দরবনে যাবার পথে বিদ্যানন্দকাঠিতে আসেন। স্থানীয় প্রাচীন দীঘিটি উলুঘ-খান-জাহানের দীঘি নামে পরিচিত এবং প্রতি বছর তার মৃত্যু দিনে এই দীঘির পাড়ে মেলা বসে। দীঘির পাড়ে পুরনো ইটের স্তুপ রয়েছে। যেখানে জনসাধারণ হাত দেয় না। কারণ স্থানীয় বিশ্বাস মতে, ইটে হাত দিলেই ঐ ব্যক্তির মৃত্যু অবধারিত। উল্লেখ্য, ১৯০১ সালে স্থাপিত রাসবিহারী ইনস্টিটিউট নামের উচ্চ বিদ্যালয়টির কারণেও এই গ্রামের সুখ্যাতি রয়েছে।

চৌগাছা : যশোর জেলার অন্যতম জনপদ ও ব্যবসা কেন্দ্র চৌগাছা। নীল বিদ্রোহে চৌগাছার লোকের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ১৭শ শতাব্দীর শেষার্ধে ম্যাজিস্ট্রেট বিউফোর্ড যশোর চৌগাছা সড়ক নির্মাণ করেন। গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর একটি বিরাট অংশ কৃষি কাজ, মাছ ধরা ও মাছ চাষে নিয়োজিত। নীল বিদ্রোহের কিছু স্বাক্ষর এখনো খুঁজে পাওয়া যায়।

ঝিকরগাছা : কপোতাক্ষ নদের তীরে অবস্থিত ঝিকরগাছা একসময় নীলকর ম্যাকানজি'র নামানুসারে ম্যাকানজিগঞ্জ নামে পরিচিত ছিল। এটি যশোরের একটি সমৃদ্ধ ব্যবসা কেন্দ্র। এখানে পাট ও গুড়ের বড় বাজার রয়েছে। ঝিকরগাছা রেল ও সড়কপথে খুলনা ও ভারতের সাথে যুক্ত। এখানকার স্টেশনটি ঝিকরগাছা ঘাট নামে পরিচিত। সুন্দরবন থেকে কাঠ এবং খুলনা ও পার্শ্ববর্তী এলাকার পাট নৌকায় করে ঝিকরগাছা ঘাটে আসে। এরপরে ট্রেন বা সড়কপথে দৌলতপুর, যশোরের বিভিন্ন কাঠের কল ও দেশের অন্যত্র যায়। এখানে নীলকরদের কিছু নিদর্শন এখনো রয়ে গেছে।

মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচিহ্ন : এ ছাড়া এই জেলায় মহান মুক্তিযুদ্ধের কিছু স্মৃতিচিহ্ন রয়েছে। যশোর সেনানিবাসে পদাধিকারভুক্ত সৈন্যরা ১৯৭১ সালে ক্যাপ্টেন হাফিজ উদ্দীন এবং লেফট্যানেন্ট আনোয়ার-এর নেতৃত্বে পাক সেনাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেন। এই মুখোমুখি যুদ্ধে প্রায় ৩০০ জন মুক্তিসেনা নিহত হন। চাঁচড়ায় মুক্তিসেনারা ৫০ জন পাক সৈন্যকে হত্যা করেন। জেলায় মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি বিজড়িত ৫টি স্মৃতিস্তম্ভ ও একটি গণহত্যার স্থান রয়েছে।

যশোর জেলার উল্লেখযোগ্য কয়টি প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন হল চাঁচড়া রাজবাড়ি, কালি মন্দির, গাজী কালুর দরগা, রাজবাড়ীর দীঘি, সিদ্ধিরপাশার মন্দির, ১২ শতাব্দীর রাজা মুকুট রায়ের প্রাসাদ, ১৭ শতাব্দীর নবাব মীর জুমলা ও মুরলীর হাজী মুহাম্মদ মুহসীন-এর ইমাম বাড়ি ইত্যাদি।

অভয়নগরের ১১ দুয়ারী মসজিদ, মধ্যপুর নীলকুঠি, শ্রীধরপুর জমিদার বাড়ি, ঝিকরগাছা উপজেলার লৌজনির মুকুট রায়-এর রাজবাড়ী, কেশবপুর উপজেলার ভারতবাজার রাজবাড়ী উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া যশোর সদর উপজেলায়ও নানা কীর্তি ও প্রত্নতাত্ত্বিক ঐতিহ্যের সন্ধান মেলে।

সমন্বিত উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা

প্রোগ্রাম ডেভেলপমেন্ট অফিস-সমন্বিত উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (পিডিও-আইসিজেডএমপি) পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো)-র একটি প্রকল্প। এটি একটি বহুখাতভিত্তিক এবং বহুপ্রতিষ্ঠানভিত্তিক উদ্যোগ। একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় স্টিয়ারিং কমিটি এবং একটি টেকনিক্যাল কমিটির নির্দেশনায় এটি পরিচালিত হয়। আনুষ্ঠানিকভাবে এর কার্যক্রম শুরু হয়েছে ফেব্রুয়ারি, ২০০২ সালে।

উপকূলীয় উন্নয়নের সার্বিক লক্ষ্য হচ্ছে এমন একটি পরিবেশ তৈরি করা যেখানে টেকসই জীবিকা উন্নয়ন এবং জাতীয় উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সাথে উপকূলীয় এলাকার উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সমন্বয় সাধন করা যায়।

এই প্রকল্পের কর্মকাণ্ডকে ছয়টি কর্মসূচিতে ভাগ করা হয়েছে -

- উপকূল অঞ্চল নীতি প্রণয়ন
- উপকূল অঞ্চলের জন্য কর্মকৌশল প্রণয়ন
- উপকূল অঞ্চলের উন্নয়নে বিনিয়োগ পরিকল্পনা প্রণয়ন
- উপকূল অঞ্চলের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন
- প্রতিষ্ঠান ও প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা
- একটি সমন্বিত জ্ঞান ভাণ্ডার

বর্তমানে প্রকল্প থেকে বহু বিশ্লেষণধর্মী প্রতিবেদনসহ উপকূল অঞ্চল নীতি প্রণীত হয়েছে। উপকূল অঞ্চলের সার্বিক উন্নয়নের রূপরেখা প্রণয়নে উপকূলীয় এলাকার গণমানুষের পরামর্শ ও মতামত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আর তাই প্রকল্প শুরুর সময় থেকে আজ অবধি সমন্বিত উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনা ও জেলাবাসীর অংশগ্রহণে অনেকগুলো বৈঠক, গবেষণা ও মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এরই ধারাক্রমিক বিবরণ নীচে তুলে ধরা হল।

উপকূলীয় অঞ্চলের মানুষের দৃষ্টিভঙ্গী অধ্যয়ন	**জুলাই-আগষ্ট, ২০০২**
উপকূলীয় জেলার বিপদাপন্নতার কারণ অধ্যয়ন	**জুলাই, ২০০৩**
খসড়া উপকূল অঞ্চল নীতির উপর জেলা পর্যায়ে মতবিনিময় সভা	**অক্টোবর, ২০০৩**

জনসাধারণের সার্বিক অবস্থা জানার লক্ষ্যে পারস্পরিক আন্তঃক্রিয়ার বিষয়টি এখানেই থেমে নেই। প্রকল্পের পরিকল্পনা অনুযায়ী এটি একটি চলমান প্রক্রিয়া হিসেবে চলতে থাকবে। খুব শিগগিরই প্রকল্প ও জেলাবাসীর অংশগ্রহণে উপকূলীয় উন্নয়ন কৌশল নির্ধারণের উপর আলোচনা ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হবে।